সিন্ধু থেকে বঙ্গ

ভারতীয় উপমহাদেশ

হাজার বছর মুসলিম শাসনের
স্বর্ণালি ইতিহাস

(৭১২–১৮৫৭ খ্রি.)

সিন্ধু থেকে বঙ্গ

প্রথম খণ্ড

মনযূর আহমাদ

চেতনা

চেতনা

সিন্ধু থেকে বঙ্গ (প্রথম খণ্ড)
মনযূর আহমাদ

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশক খুরশিদ আমজাদী
স্বত্ব প্রকাশক
ব্যবস্থাপক বোরহান আশরাফী
সার্বিক সমন্বয় সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশনায় চেতনা
১১/১, ইসলামী টাওয়ার
দোকান নং ২০ (১ম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল নং : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩,
০১৩০৩-৮৫৫২২৫
অনলাইন পরিবেশক রকমারি, ওয়াফি লাইফ, কুইককার্ট, বইজগৎ, সমাহার
প্রচ্ছদ মুনির সাদাত
পৃষ্ঠাসজ্জা আবু ওয়ারদাহ
মুদ্রণ মা মনি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রিত মূল্য ৯৫০ ৳

© প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

মুহাম্মদ বিন কাসিম

যার সিন্ধু জয়ের ধারায় ভারত ইসলামকে
আপনের মতো বরণ করে নেয়

এবং

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি

যার বিস্ময় জাগানিয়া অভিযানের মধ্য দিয়ে
বঙ্গে ইসলামের বিজয়ী ধারার সূচনা হয়।

— বি ষ য় সূ চি —

▶ কৈফিয়ত ও আশাবাদ ┊ ২১
▶ ভূমিকা ┊ ২৫
▶ **প্রথম অধ্যায় : শিকড়ের ইতিহাস** ┊ ৩৩
  ▶ ইবরাহিম আ.-এর মুনাজাত ┊ ৩৩
  ▶ ঈসা আ.-এর খোশখবর ┊ ৩৪
  ▶ ইহুদি ও বনি ইসরাইল ┊ ৩৫
  ▶ আফগান বনি ইসরাইল ┊ ৩৬
  ▶ মালাবারে ইসলাম ┊ ৪১
  ▶ মালাবার দেশ ┊ ৪১
  ▶ মালাবারে নির্মিত মসজিদের তালিকা ┊ ৪৩
  ▶ সিন্ধু বিজয় ┊ ৪৪
▶ **দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও ভারতের গোড়ার কথা** ┊ **৫৩**
  ▶ আর্য কারা? ┊ ৫৪
  ▶ রাজপুত কারা? ┊ ৬২
▶ **তৃতীয় অধ্যায় : প্রাচীন কালে ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয়** ┊ **৭৫**
  ▶ সুলতানি আমলে শিক্ষা ┊ ৯৩
  ▶ শিক্ষায় মুসলিম শাসকদের অবদান ┊ ৯৬
  ▶ নারী শিক্ষা ┊ ৯৯
  ▶ চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা ┊ ৯৯
  ▶ দরসে নেজামির বিকাশধারা ┊ ১০০
  ▶ ফিরিঙ্গি মহল এবং মোল্লা নিজামুদ্দিন ও দরসে নেজামির সূচনা ┊ ১০৩
▶ **চতুর্থ অধ্যায় : ইসলাম প্রচারে ওলি-আউলিয়ার অবদান** ┊ **১১১**
  ▶ কুতুবুদ্দিন কাকি রাহ.-এর খলিফাগণ ┊ ১১৭
  ▶ খাজা ফরিদুদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর রাহ. ┊ ১১৮
  ▶ শায়েখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাহ. ┊ ১২৩

▸ শায়েখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া রাহ.-এর খলিফাগণের তালিকা ⁞ ১২৭
▸ শায়েখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দেহলবি রাহ. ⁞ ১২৮
▸ **পঞ্চম অধ্যায় : বঙ্গে ইসলাম প্রচার** ⁞ ১৩৫
▸ আয়েনায়ে হিন্দুস্তান শায়খ সিরাজ ⁞ ১৩৮
▸ শায়খ আলাউদ্দিন আলাউল হক বাঙালি লাহোরি রাহ. ⁞ ১৩৯
▸ নুর কুতুবে আলম রাহ. ⁞ ১৪০
▸ শাহ জালাল মুজাররাদ ইয়েমেনি রাহ. ⁞ ১৪৫
▸ সিলেটে ইসলামের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা ⁞ ১৪৮
▸ **ষষ্ঠ অধ্যায় : বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ** ⁞ ১৬১
▸ **সপ্তম অধ্যায় : ভারতে মুসলিমশাসনের ঐতিহাসিক অবদান** ⁞ ১৭৯
▸ মুসলিমদের ঐতিহাসিক অবদান ⁞ ১৮৫
▸ বৈষয়িক ও আত্মিক অগ্রগতি ⁞ ১৮৫
▸ **অষ্টম অধ্যায় : ভারতবর্ষে মুসলিমশাসনের সূচনা** ⁞ ১৯৩
▸ ভারতভূমি ⁞ ১৯৩
▸ মুসলিম শাসন যুগের ইতিহাসের ঐতিহাসিক উপাদান ⁞ ১৯৫
▸ **নবম অধ্যায় : মুসলিমদের বিজয় প্রাক্কালে ভারতের সমাজ ও পরিবেশ** ⁞ ২০৭
▸ রাজনৈতিক অবস্থা ⁞ ২০৭
▸ উত্তর-ভারতের রাজ্যসমূহ ⁞ ২০৭
▸ দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যসমূহ ⁞ ২১০
▸ সে সময়ের প্রশাসন ⁞ ২১১
▸ সে সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা ⁞ ২১২
▸ সে সময়ের ধর্মীয় অবস্থা ⁞ ২১২
▸ সে সময়ের সামাজিক অবস্থা ⁞ ২১২
▸ **দশম অধ্যায় : মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়** ⁞ **২১৫**
▸ ভারতের সাথে আরবদের সম্পর্ক ⁞ ২১৫
▸ সিন্ধু অভিযানের কারণ ⁞ ২১৮
▸ মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু অভিযান ⁞ ২২০

▶ মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যু ⁞ ২২৩
▶ মুহাম্মদ বিন কাসিমের কৃতিত্ব ও চরিত্র ⁞ ২২৫
▶ আরবদের সাফল্যের কারণ ⁞ ২২৮
▶ আরবদের সিন্ধুবিজয়ের ফলাফল ⁞ ২২৯
▶ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ⁞ ২৩২
▶ সিন্ধু বিজয়-সূত্রে ভারতে ইলম সাধনা ⁞ ২৩৪
▶ জ্ঞানবিজ্ঞানে আরব ও ভারতবর্ষের সংযোগ ⁞ ২৩৫
▶ সিন্ধুতে মুসলিমশাসন ⁞ ২৩৭
▶ সিন্ধুর পরবর্তী ইতিহাস ⁞ ২৪০
▶ সিন্ধুরাজ্যে আরবশক্তির পতনের কারণ ⁞ ২৪১
▶ সিন্ধুদেশে আরব শাসনের তাৎপর্য ⁞ ২৪২

▶ একাদশ অধ্যায় : গজনি বংশ ⁞ ২৪৫

▶ গজনি বংশের উত্থান ⁞ ২৪৫
▶ আলপ্তগিন (৯৬২-৯৬৩ খ্রি.) ⁞ ২৪৬
▶ গজনি বংশের প্রতিষ্ঠা ⁞ ২৪৬
▶ স বু ক্ত গি ন (৯৭৭-৯৯৭ খ্রি.) ⁞ ২৪৮
▶ সুলতান মাহমুদ (৯৯৭-১০৩০ খ্রি.) ⁞ ২৫৩
▶ সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহ ⁞ ২৫৮
▶ সোমনাথের বিরুদ্ধে অভিযান ও এর কারণ ⁞ ২৬৫
▶ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ⁞ ২৬৬
▶ মাহমুদের সাফল্যের নেপথ্যে ⁞ ২৭০
▶ মাহমুদের অভিযানের ফলাফল ⁞ ২৭১
▶ সুলতান মাহমুদের কৃতিত্ব ও চরিত্র ⁞ ২৭২
▶ শাসক হিসেবে মাহমুদ ⁞ ২৭৪
▶ মাহমুদের ন্যায়পরায়ণতা ⁞ ২৭৫
▶ শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ⁞ ২৭৫
▶ মাহমুদের চরিত্র ⁞ ২৭৬
▶ আবু রায়হান আল-বেরুনি ⁞ ২৭৭
▶ সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারীগণ ⁞ ২৭৯

▸ ঘুর বংশের উত্থান ┆ ২৮২

▸ গজনি বংশের পতনের কারণ ┆ ২৮৩

▸ **দ্বাদশ অধ্যায় : ঘু র ব ং শ** ┆ ২৮৫

▸ শিহাবুদ্দিন ঘুরি (১১৯২-১২০৬ খ্রি.) ┆ ২৮৫

▸ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উত্তর-ভারতের পরিস্থিতি ┆ ২৮৭

▸ মুহাম্মদ ঘুরির ভারত অভিযান ┆ ২৮৯

▸ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ ┆ ২৯১

▸ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ┆ ২৯১

▸ মিরাট, কোইল ও দিল্লি অধিকার ┆ ২৯৩

▸ কনৌজের বিরুদ্ধে অভিযান ┆ ২৯৪

▸ চন্দবারের যুদ্ধে জয়চাঁদের পরাজয় ┆ ২৯৪

▸ গোয়ালিয়র ও আনহিলওয়ার জয় ┆ ২৯৪

▸ কালিঞ্জর জয় ┆ ২৯৫

▸ মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বিহার অধিকার ┆ ২৯৫

▸ বঙ্গ অভিযান ও বখতিয়ারের নদিয়া প্রবেশ ┆ ২৯৬

▸ লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন ┆ ২৯৭

▸ মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যু ┆ ২৯৮

▸ ঘুর বংশের অবসান ┆ ২৯৯

▸ মুসলিমদের বিজয়ের কারণ ┆ ২৯৯

▸ ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ঘুরির কৃতিত্ব ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ┆ ৩০০

▸ তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ┆ ৩০১

▸ সুলতান মাহমুদের সাথে ঘুরির তুলনা ┆ ৩০৩

—বিজেতা হিসেবে ┆ ৩০৩

—শিল্প ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ┆ ৩০৪

—সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ┆ ৩০৪

▸ **ত্রয়োদশ অধ্যায় : দিল্লির তুর্কি সাম্রাজ্য** ┆ ৩০৫

▸ কুতুবুদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বংশকে দাসবংশ বলা অযৌক্তিক ┆ ৩০৫

▸ প্রাথমিক আমলের সুলতানগণ তুর্কি, আফগান নন ┆ ৩০৬

▶ **সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২২০ খ্রি.) ┆ ৩০৭**
- ▶ দিল্লির সুলতান পদে কুতুবুদ্দিন ┆ ৩০৮
- ▶ তাজুদ্দিনের সাথে সংঘর্ষ ┆ ৩০৯
- ▶ কুতুবুদ্দিনের কৃতিত্ব ┆ ৩১০
- ▶ সামরিক দক্ষতা ও সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ ┆ ৩১০
- ▶ আহরম শাহ (১২১০-১২১১ খ্রি.) ┆ ৩১২

▶ **সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) ┆ ৩১৩**
- ▶ বিদ্রোহী সর্দারদের দমন এবং ইলদুজ ও কুবাচার পরাজয় ┆৩১৪
- ▶ চেঙ্গিস খানের আক্রমণ ┆ ৩১৫
- ▶ বঙ্গে ইলতুতমিশের অভিযান ┆ ৩১৬
- ▶ ইলতুতমিশের খেতাব লাভ ┆ ৩১৭
- ▶ ইলতুতমিশের রাজ্যজয় ┆ ৩১৭
- ▶ ইলতুতমিশের শাসনব্যবস্থা ┆ ৩১৮
- ▶ ইলতুতমিশের কৃতিত্ব-বিচার ┆ ৩২০
- ▶ প্রাথমিক তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ┆ ৩২০
- ▶ আরবি মুদ্রার প্রচলন ┆ ৩২২
- ▶ শাসক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব ┆ ৩২২
- ▶ চরিত্র ┆ ৩২৩
- ▶ রুকনুদ্দিন ফিরোজ ┆ ৩২৪

▶ **সুলতানা রাজিয়া (১২৩৭-১২৪০ খ্রি.) ┆ ৩২৫**
- ▶ সিংহাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ┆ ৩২৬
- ▶ রাজিয়া ও আলতুনিয়ার মৃত্যু ┆ ৩২৭
- ▶ রাজিয়ার বৈশিষ্ট্য ┆ ৩২৭
- ▶ যোগ্য ও জ্ঞানী শাসক ┆ ৩২৮
- ▶ বাহরম শাহ (১২৪০-১২৪২ খ্রি.) ┆ ৩২৮
- ▶ মাসুদের সিংহাসন লাভ ┆ ৩২৮

▶ **সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি.) ┆ ৩২৯**

▶ **গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.) ┆ ৩৩২**
- ▶ বলবনের সিংহাসন আরোহণ (১২৬৬ খ্রি.) ┆ ৩৩৪

▶ কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্গঠন ⁞ ৩৩৫
▶ সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ⁞ ৩৩৬
▶ গুপ্তচর বাহিনী ⁞ ৩৩৭
▶ দস্যু ও বিদ্রোহী দমনের ব্যবস্থা ⁞ ৩৩৮
▶ দোয়াব ও কাথিয়ারে বিদ্রোহীদের শাস্তিদান ⁞ ৩৩৯
▶ চেহেলগানের ক্ষমতা রহিতকরণ ⁞ ৩৩৯
▶ বলবনের মোঙ্গলনীতি ⁞ ৩৪০
▶ বলবনের বিদেশনীতি ⁞ ৩৪০
▶ বঙ্গে বিদ্রোহ ⁞ ৩৪২
▶ বুগরা খানকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিয়োগ ⁞ ৩৪৩
▶ শাহজাদা মুহাম্মদের মৃত্যু ⁞ ৩৪৪
▶ বলবনের মৃত্যু (১২৮৭ খ্রি.) ⁞ ৩৪৪
▶ রাজা ও রাজত্ব সম্বন্ধে বলবনের ধারণা ⁞ ৩৪৪
▶ রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য ⁞ ৩৪৫
▶ সেনাবিন্যাস ⁞ ৩৪৬
▶ বলবনের কৃতিত্ব ও চরিত্র ⁞ ৩৪৭
▶ বলবনের শাসননীতির পর্যালোচনা ⁞ ৩৪৮
▶ কায়কোবাদ (১২৮৭-৮৯ খ্রি.) ⁞ ৩৫২
▶ খিলজি বিপ্লব ⁞ ৩৫৩
▶ তুর্কি-খিলজি বিরোধ ⁞ ৩৫৩
▶ কাইমুর্সের ক্ষমতা লাভ ⁞ ৩৫৩
▶ ফিরোজ খিলজির স্বাধীনতা ঘোষণা ⁞ ৩৫৩
▶ প্রাথমিক তুর্কি শাসনের অবসান ⁞ ৩৫৩
▶ খিলজি-শাসনের তাৎপর্য ⁞ ৩৫৪

▶ **চতুর্দশ অধ্যায় : খি ল জি ব ং শ (১২৯০-১৩২০ খ্রি.)** ⁞ ৩৫৭
▶ খিলজি বংশের আদি পরিচয় ⁞ ৩৫৮
▶ জালালুদ্দিন খিলজি (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.) ⁞ ৩৫৯
▶ মালিক সাজজুর বিদ্রোহ ⁞ ৩৬০
▶ সিদি মাওলার হত্যাকাণ্ড ⁞ ৩৬০

▶ উলুগ খানের ইসলাম গ্রহণ ┋ ৩৬২
▶ আলাউদ্দিনের দেবগিরি অভিযান ┋ ৩৬৩

▶ **আলাউদ্দিন খিলজি (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) ┋ ৩৬৫**
▶ মোঙ্গল আক্রমণ ┋ ৩৬৯
▶ প্রথম আক্রমণ (১২৯৬ খ্রি.) ┋ ৩৬৯
▶ দ্বিতীয় আক্রমণ (১২৯৭ খ্রি.) ┋ ৩৭০
▶ তৃতীয় আক্রমণ (১২৯৮ খ্রি.) ┋ ৩৭০
▶ চতুর্থ আক্রমণ (১৩০৩ খ্রি.) ┋ ৩৭০
▶ পঞ্চম আক্রমণ (১৩০৪ খ্রি.) ┋ ৩৭০
▶ ষষ্ঠ আক্রমণ (১৩০৬ খ্রি.) ┋ ৩৭১
▶ সর্বশেষ আক্রমণ (১৩০৭-৮ খ্রি.) ┋ ৩৭১
▶ মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিনের গৃহীত ব্যবস্থা ┋ ৩৭১
▶ মোঙ্গল আক্রমণের ফলাফল ┋ ৩৭২
▶ উত্তর-ভারত বিজয় ┋ ৩৭৩
▶ গুজরাট বিজয় ┋ ৩৭৬
▶ মোঙ্গল নওমুসলিমদের দমন ┋ ৩৭৮
▶ দাক্ষিণাত্য বিজয় ┋ ৩৮০
▶ বরঙ্গল, দ্বারসমুদ্র ও মেবার বিজয় ┋ ৩৮০
▶ মালিক কাফুরের শেষ অভিযান ┋ ৩৮১
▶ আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্যনীতির প্রকৃতি ┋ ৩৮১
▶ দাক্ষিণাত্যনীতির তাৎপর্য ┋ ৩৮২
▶ রাজক্ষমতা সম্বন্ধে আলাউদ্দিনের দর্শন ┋ ৩৮৩
▶ আলাউদ্দিন খিলজির শাসনব্যবস্থা ┋ ৩৮৪
▶ শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ┋ ৩৮৫
▶ আলাউদ্দিনের আমলে হিন্দুদের অবস্থা ┋ ৩৮৭
▶ রাজস্ব সংস্কার ┋ ৩৮৯
▶ সামরিক সংস্কার ┋ ৩৯০
▶ মহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ┋ ৩৯১
▶ মূল্যনিয়ন্ত্রণের ফলাফল ┋ ৩৯৫

▶ মূল্যনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাফল্যের নেপথ্যে ┊ ৩৯৬
▶ আলাউদ্দিনের শেষজীবন : মৃত্যু ১৩১৬ খ্রি. ┊ ৩৯৬
▶ আলাউদ্দিন খিলজির কৃতিত্ব ও চরিত্র ┊ ৩৯৭
▶ বিজয়ী হিসেবে ┊ ৩৯৮
▶ শাসক হিসেবে ┊ ৩৯৮
▶ ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ┊ ৩৯৯
▶ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ ┊ ৪০০
▶ সুলতানের শাসননীতির সমালোচনা ┊ ৪০১
▶ আলাউদ্দিন খিলজির উত্তরাধিকারীগণ ┊ ৪০৩
▶ সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক খিলজি (১৩১৬-১৩২০ খ্রি.) ┊ ৪০৪

▶ **পঞ্চদশ অধ্যায় : তু ঘ ল ক ব ং শ (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.)** ┊ ৪০৭

▶ **গিয়াসুদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)** ┊ ৪০৭
▶ আমিরশ্রেণির প্রতি সদয় ব্যবহার ┊ ৪০৮
▶ অর্থসংকট দূরীকরণের প্রচেষ্টা ┊ ৪০৮
▶ বরঙ্গল বিজয় ┊ ৪০৮
▶ বঙ্গে দিল্লির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ┊ ৪০৯
▶ শাসনব্যবস্থা ┊ ৪১১

▶ **মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)** ┊ ৪১৩
▶ বাহাউদ্দিন গোরশ-আস্‌পের বিদ্রোহ ┊ ৪১৬
▶ দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন ┊ ৪১৮
▶ দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপনের কারণ ┊ ৪১৯
▶ ঐতিহাসিকদের বাদানুবাদ ┊ ৪২০
▶ খোরাসান অভিযান ┊ ৪২৪
▶ করাচিল বা কুর্মাচল অভিযান ┊ ৪২৫
▶ প্রতীকী তাম্রমুদ্রার প্রচলন ┊ ৪২৭
▶ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীকী মুদ্রার প্রবর্তন ┊ ৪২৭
▶ দোয়াবে কর বৃদ্ধি ॥ বারানির অভিযোগ ┊ ৪২৯
▶ পরিকল্পনার সমালোচনা ┊ ৪৩০
▶ প্রত্যেকটি পরিকল্পনা ছিল সুচিন্তিত ও কল্যাণধর্মী ┊ ৪৩০

- ▶ পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ ┆ ৪৩১
- ▶ সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ┆ ৪৩১
- ▶ মেবারের স্বাধীনতা ┆ ৪৩২
- ▶ বাংলার স্বাধীনতা ┆ ৪৩২
- ▶ অযোধ্যায় বিদ্রোহ ┆ ৪৩২
- ▶ বিজয়নগরের স্বাধীনতা ┆ ৪৩৩
- ▶ বাহমনি-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ┆ ৪৩৩
- ▶ মৃত্যু (১৩৫১ খ্রি.) ┆ ৪৩৩
- ▶ শাসনব্যবস্থা ┆ ৪৩৩
- ▶ শাসন ও বিচারবিভাগ ┆ ৪৩৬
- ▶ সুলতানের ব্যর্থতার নেপথ্যে ┆ ৪৩৭

▶ ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) ┆ ৪৪০

- ▶ বঙ্গ অভিযান ┆ ৪৪৩
- ▶ বঙ্গের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান (১৩৫৯-১৩৬০ খ্রি.) ┆ ৪৪৪
- ▶ উড়িষ্যা জয় ┆ ৪৪৫
- ▶ ফিরোজ শাহের শাসননীতি ┆ ৪৪৬
- ▶ ফিরোজ শাহের শাসনব্যবস্থা জায়গির-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ┆ ৪৪৬
- ▶ ধর্মীয় নীতি ┆ ৪৫০
- ▶ মৃত্যু (১৩৮৮ খ্রি.) ┆ ৪৫০
- ▶ ফিরোজ শাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব ┆ ৪৫১
- ▶ বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত ┆ ৪৫১
- ▶ ফিরোজ শাহের কৃতিত্ব ┆ ৪৫১
- ▶ আলেমদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ┆ ৪৫৩
- ▶ তুঘলক বংশের পতনে ফিরোজ শাহের দায় ┆ ৪৫৪
- ▶ পতনের পথে তুঘলক বংশ ┆ ৪৫৫

▶ ষোড়শ অধ্যায় : তৈমুরের ভারত আক্রমণ ও তুঘলক বংশের পতনের নেপথ্য কারণ (১৩৯৮-১৩৯৯ খ্রি.) ┆ ৪৫৭

- ▶ ভারত আক্রমণ করার নেপথ্যে ┆ ৪৫৭
- ▶ তুঘলক বংশের পতনের নেপথ্যে ┆ ৪৬০

▸ **সপ্তদশ অধ্যায় : দিল্লিকেন্দ্রিক সুলতানি শাসনের পতনযুগ ┆ ৪৬৫**
▸ **সৈয়দ বংশ ও খিজির খান (১৪১৪-১৪৫১ খ্রি.) ┆ ৪৬৫**
▸ পরবর্তী সৈয়দগণ (১৪২১-১৪৫১ খ্রি.) ┆ ৪৬৭
▸ মুবারক শাহ ┆ ৪৬৭
▸ মুহাম্মদ শাহ ┆ ৪৬৮
▸ আলম শাহ ┆ ৪৬৮
▸ **অষ্টাদশ অধ্যায় : লো দি ব ং শ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি.) ┆ ৪৬৯**
▸ **বাহলুল লোদি (১৪৫১-১৪৮৮ খ্রি.) ┆ ৪৬৯**
▸ লোদি-বংশের পরিচয় ┆ ৪৬৯
▸ **সিকান্দার লোদি (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.) ┆ ৪৭২**
▸ লোদি বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ┆ ৪৭৩
▸ ইবরাহিম লোদি (১৫১৭-১৫২৬ খ্রি.) ┆ ৪৭৬
▸ জালাল খানের পরাজয় ┆ ৪৭৮
▸ পানিপথের যুদ্ধে ইবরাহিম লোদির পরাজয় ┆ ৪৭৯
▸ **ঊনবিংশ অধ্যায় : দিল্লির সুলতানি শাসনের পতনের নেপথ্য কারণ ┆ ৪৮১**
▸ ১. শাসনে একতা রক্ষায় ব্যর্থতা ┆ ৪৮১
▸ ২. সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাব ┆ ৪৮২
▸ ৩. উত্তরাধিকারের সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব ┆ ৪৮২
▸ ৪. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও ফিরোজ শাহের দুর্বল শাসনব্যবস্থা ┆ ৪৮৩
▸ ৫. কেন্দ্রবিমুখ-প্রবণতা ┆ ৪৮৩
▸ ৬. হিন্দুদের প্রতিবন্ধকতা ┆ ৪৮৪
▸ ৭. শাসকদের নৈতিক অবনতি ┆ ৪৮৪
▸ ৮. ইবরাহিম লোদির ঔদ্ধত্য ও আমিরগণের ক্ষমতালিপ্সা ┆ ৪৮৪
▸ ৯. বারবার বহিরাক্রমণ ┆ ৪৮৫
▸ **বিংশ অধ্যায় : আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যসমূহের উত্থান ┆ ৪৮৭**
▸ বঙ্গের স্বাধীন সুলতানি শাসন ┆ ৪৮৭
▸ ইলিয়াস-শাহি বংশের অধীনে বঙ্গদেশ (১৩৪২-১৪১৪ খ্রি.) ┆ ৪৮৮

▸ **ইলিয়াস-শাহি বংশ ┆ ৪৮৯**
▸ **সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রি.) ┆ ৪৮৯**
  ▸ ত্রিহুতবিজয় ও নেপাল অভিযান ┆ ৪৯০
  ▸ উড়িষ্যা অভিযান ┆ ৪৯০
  ▸ চম্পারণ ও গোরক্ষপুর বিজয় ও পূর্ববঙ্গ অধিকার ┆ ৪৯০
  ▸ ইলিয়াস শাহের কৃতিত্ব ┆ ৪৯২
  ▸ রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও শাসনকার্যে দক্ষতা ┆ ৪৯৩
  ▸ ধর্মনিষ্ঠা ┆ ৪৯৪
  ▸ বাঙালি জাতীয়তার স্রষ্টা ┆ ৪৯৪
  ▸ সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯৩ খ্রি.) ┆ ৪৯৫
  ▸ গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রি.) ┆ ৪৯৭
  ▸ রাজা গণেশ ও তার উত্তরাধিকারীগণ (১৪১০-৪২ খ্রি.) ┆ ৪৯৮
  ▸ রাজা গণেশের পরিচয় ┆ ৪৯৮
  ▸ যদুর ইসলাম গ্রহণ ┆ ৪৯৯
  ▸ পরবর্তী ইলিয়াস-শাহি বংশের শাসন ┆ ৫০০
▸ **ইলিয়াস-শাহি বংশের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার (১৪৫২-১৪৮৬) ┆ ৫০০**
  ▸ নাসিরুদ্দিন শাহ (১৪৫২-১৪৫৯ খ্রি.) ┆ ৫০০
  ▸ রুকনুদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) ┆ ৫০৩
  ▸ শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) ┆ ৫০৫
  ▸ হাবশি রাজন্যবর্গ (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রি.) ┆ ৫০৬
  ▸ ইলিয়াস-শাহি বংশের অবদান ┆ ৫০৭
▸ **হুসাইন-শাহি বংশের অধীনে বঙ্গ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) ┆ ৫০৭**
▸ **আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) ┆ ৫০৮**
  ▸ হুসাইন শাহের কৃতিত্ব ┆ ৫১৩
▸ **নু স র ত শা হ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) ┆ ৫১৫**
  ▸ বাবরের সাথে নুসরত শাহের সন্ধি ┆ ৫১৬
  ▸ মুঘলবিরোধী মিত্রসংঘ ┆ ৫১৬
  ▸ স্থাপত্যশিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ┆ ৫১৬
  ▸ কৃতিত্ব ┆ ৫১৭

▸ **জৌনপুর ┊ ৫১৮**
▸ খাজা জাহানের পরিচয় ও জৌনপুরে শার্কি শাসনের সূচনা ┊ ৫১৮
▸ ইবরাহিম শাহ শার্কি : জৌনপুরের শ্রেষ্ঠ সুলতান ┊ ৫১৮
▸ হুসাইন শাহ শার্কি জৌনপুরের শেষ স্বাধীন সুলতান ┊ ৫২০
▸ **মালব বা মারওয়া ┊ ৫২১**
▸ মালবের ঘুরি সুলতান ┊ ৫২১
▸ মাহমুদ খানের কৃতিত্ব ┊ ৫২২
▸ মালবের শেষ স্বাধীন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ ┊ ৫২৩
▸ **গুজরাট ┊ ৫২৪**
▸ আলাউদ্দিন খিলজি কর্তৃক প্রথম গুজরাট বিজয় (১২৯৭ খ্রি.) ┊ ৫২৪
▸ স্বাধীন গুজরাটের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ শাহ ┊ ৫২৪
▸ গুজরাটের শেষ বিখ্যাত সুলতান বাহাদুর শাহ ┊ ৫২৬
▸ **কাশ্মীর ┊ ৫২৭**
▸ **বাহমনি রাজ্য ┊ ৫৩০**
▸ আহমদ শাহ (১৪২২-১৪৩৫ খ্রি.) ┊ ৫৩২
▸ বরঙ্গল অধিকার এবং বিদরে রাজধানী স্থানান্তর ┊ ৫৩২
▸ বাহমনিরাজ্যের পতন ┊ ৫৩৪
▸ **খান্দেশ রাজ্য ┊ ৫৩৫**
▸ **হিন্দু রাজ্য ┊ ৫৩৬**
▸ বিজয়নগর রাজ্য ┊ ৫৩৬
▸ উত্তর-ভারতের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিজয়নগরের গুরুত্ব ┊ ৫৩৭
▸ তেলিকোটার যুদ্ধের গুরুত্ব ┊ ৫৩৮
▸ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ┊ ৫৪০
▸ ভাস্কো দা গামা ┊ ৫৪১
▸ **একবিংশ অধ্যায় : দিল্লির সুলতানদের শাসন, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ┊ ৫৪৩**
▸ দিল্লি সালতানাতের শাসন-প্রকৃতি ┊ ৫৪৩
▸ সুলতানগণের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ┊ ৫৪৫

▶ পরিষদ ⋮ ৫৪৬
▶ কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ⋮ ৫৪৭
▶ বিচারবিভাগ ⋮ ৫৫২
▶ সামাজিক পরিস্থিতি ⋮ ৫৫৪
▶ হিন্দুদের অবস্থা ⋮ ৫৫৬
▶ শিল্প ও বাণিজ্য ⋮ ৫৫৯
▶ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে মুসলিমদের অবদান ⋮ ৫৬১
▶ সভ্যতায় ইসলামের অবদান ⋮ ৫৬৭

কৈফিয়ত ও আশাবাদ

এই বই লেখার উপযুক্ত আমি নই। আমি ইতিহাসে প্রাজ্ঞ নই, গবেষকও নই। বেশি বেশি ইতিহাসের পাঠক বলা যায়। এতটুকু বলা যায়, পাঠের মুগ্ধতা থেকে এই বই লেখা। বইটি ছোট হবে না সে ধারণা ছিল; তবে এত বড় হবে ভাবনায় ছিল না। হাজার বছরের ইতিহাস বলে কথা...। সংক্ষেপেও বলা যেত, অনেকে বলেছেনও; তখন ইতিহাসের ধারা ও ধারাবাহিকতা বুঝতে সমস্যা হয়। তথ্যের সাথে সাথে সময়টাও ধরতে হয়, তবেই মানসপটে সঠিক চিত্রটি উদ্ভাসিত হয়।

বহুদিন থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলাম, ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের ছোট্ট এই দেশটিতে এত মুসলিমের অধিবাস ঘটেছে কীভাবে! কীভাবে এখানে এত মুসলিমের সমাগম ঘটল! এরা কি সবাই ধর্মান্তরিত, নাকি বহিরাগত?

ভারতবর্ষে মুসলিমদের দাপট ও শাসনের কেন্দ্র ছিল দিল্লি ও তার আশপাশ; বড় বড় আলেম-ওলামা, পির-মাশায়েখের খানকাও ছিল ওখানে—সেখানেও মুসলিমদের সংখ্যা কোনো কালেই পঁচিশ শতাংশের ওপরে ছিল না। কিন্তু এইখানে। এত নদী ও সোঁদা মাটির এই দেশে। শাসনের কেন্দ্র থেকে বহু বহু দূরে। যেখানে কোনো কালে কোনো নবি এসেছেন বলে শোনা যায় না। যেখানে লোকেরা নবিদের আনীত কোনো একটি পরিচিত ধর্মবিশ্বাসের সাথে আদৌ পরিচিত ছিল না। ভারতবর্ষে আগত আর্যরা তাদের নবিকে হারিয়েছিল এখানে আসারও হাজার বছর আগে, নবি ও রাসুলদের আনীত ধর্ম একত্ববাদ সম্পর্কে এখানে লোকেরা দূরতম কোনো ধারণা রাখত না। সেই ভারতের একটি প্রান্ত, একটি অঙ্গ, বঙ্গ। বিশেষত, এই পূর্ববঙ্গের লোকেরা কীভাবে আধুনিক ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম

সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিণত হলো তা আমার মনে এক বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিল। এই সূত্র থেকে এই বই রচনার সূচনা।

জাতি বিচারে বাঙালি বর্তমান আরবের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠী। বিশাল ভূ-ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলেও মুসলিমদের সংখ্যা এতটা নয়। এর পাশাপাশি বাংলার পশ্চিমাংশের তুলনায় পূর্বাংশে মুসলিম জনসংখ্যার বিরাট ব্যবধানও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়। অথচ এটি ইসলামের উৎসভূমি হেজাজ থেকে বহু বহু দূরে এবং এখানে দলে দলে সাহাবি এসে ইসলাম প্রচার করেছে ইতিহাস এমন কোনো তথ্য পরিবেশন করে না। এরই প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে ভারতবর্ষের এক হাজার বছরের ইতিহাস তুলে ধরার এই চেষ্টা।

আশা করি, পাঠক ওপরের জিজ্ঞাসার জবাব সারা বইয়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে পাবে। বিশেষত, 'বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা : একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ', এই অধ্যায়টিতে জবাবটি আরেকটু খোলাসা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই প্রতিপাদ্যে বিস্তারিত কাজ করার ইচ্ছা আছে।

বিশ্বাস করি, আমি ও আমাদের চিনতে হলে ইতিহাস জানতে হবে। আমাকে এটাও জানতে ও উপলব্ধি করতে হবে, আরব ও ভারত এক নয়। প্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য থেকে নিয়ে এখানকার মানুষের চেয়ে আরবের মানুষের জীবনাচার, মনন, রুচি, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ব্যবধান যে অনেক তা কোনো অস্পষ্ট বিষয় নয়। যারা ধর্মপ্রচার ও রাজনীতি করেন তারা এই বিষয়গুলো মনে না রাখলে ও না বুঝলে আপন চেষ্টায় ও সাধনায় পরিণামে ব্যর্থ হতে পারেন। এখানে যারা ধর্মীয় রাজনীতি করেন, তারা কেন সফলতা পাচ্ছেন না, এই বই আপনাকে সেই খোঁজও দেবে। কথিত মূলধারা নামের সুবিধাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও রাজনীতি এবং পাশ্চাত্য ধারার নিছক কেরানি তৈরির যে শিক্ষা এই দেশে চলছে তাও যে চাপিয়ে দেওয়া সেই ইঙ্গিতও ইতিহাস পাঠে জানা যাবে।

খুবই স্বাভাবিক যে, যেকোনো ধর্মাবলম্বী তার ধর্মের বই পড়েন; অবশ্যই পড়বেন। তবে তাতে কিন্তু আপনি আপনার মাটি ও মানুষের পরিচয় পাবেন না। সেই পরিচয় ওখানে থাকেও না। সেই পরিচয় কেউ ওখানে খোঁজেও না। তবে বিষয়টা মোটেই হেলা করা যায় না। কেননা নিজেকে না চিনে, নিজের প্রতিপাশের জনমণ্ডলীকে না জেনে কেউ যখন আদর্শ প্রচারে মনোনিবেশ করবেন, তখন তিনি সেখানে নিজেকে আলাদা একজন লোক হিসেবে আবিষ্কার করবেন, যদি সামান্য অনুভূতি তার থাকে। এ কারণেই প্রত্যেক আলেম, মুবাল্লিগ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজ সেবক, গবেষক, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিককে আগে নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানতে হয়।

ইতিহাস জানার এই চেষ্টার বিচারে আমাদেরকে অলসই বলতে হয়। এই অলসতার সরল অর্থ হচ্ছে, আমি সচেতন নই। আমি সত্যিকার শিক্ষিত নই। মানে, আসলে আমি আমার চোখ দিয়ে দেখতে শিখিনি এখনো। ইতিহাস হচ্ছে আমার চোখ, বিবেক ধারানোর রেত, চলার পথের নির্ভরযোগ্য বাহন। উত্থান-পতনের সাক্ষীও এই ইতিহাস। কোরআনের ভাষায় কাসাস, আমাদের ভাষায় যাকে বলি ইতিহাস, তাতে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষার উপাদান। তাই জ্ঞানীরা ইতিহাস পড়ে এবং জ্ঞানী হতে হলেও ইতিহাস পড়তে হবে।

আশা করি 'সিন্ধু থেকে বঙ্গ' আপনাকে নিজের ইতিহাস পাঠে আরেকটু মনোযোগী করে তুলবে। শিকড় ও সূত্রের সঙ্গে আপনাকে যুক্ত ও একাত্ম হতে সামান্য হলেও সাহায্য করবে।

একটি কথা, এই গ্রন্থটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্য ও শিক্ষার্থীদের পাঠের উপযোগী করে রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্তত মূল ইতিহাসটুকু থেকে যেকোনো শিক্ষার্থী সহজে ফলাফল নিরুপণ করতে পারবে।

তবে অনেক কথা বাকি আছে এবং যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে কারও ভিন্ন মত থাকতেও পারে। এবং ভুলও বলা হয়ে থাকতে পারে। সেগুলোর সংশোধনের চেষ্টায় সহযোগিতা চাই সকল উদার পাঠকের।

এই দুই খণ্ডে আত্মপরিচয়ের কথা পাওয়া যাবে। ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে মুসলিম জাতি ও শক্তি কীভাবে দাঁড়িয়েছে, বৈরী পরিবেশে কীভাবে শাসন করেছে ও সেই চেষ্টা ও সক্ষমতার কথা এখানে গভীরভাবে অবলোকন করার প্রয়াস লক্ষ করা যাবে।

এরপর সেই জাতির বিদেশি শাসন থেকে মুক্তির চেষ্টা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। যা পাওয়া যাবে এই সিরিজের বাকি খণ্ডগুলোতে। আশা করি, আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং দোয়ায় শরিক রাখবেন। ওয়া মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

মনযূর আহমাদ
৮৪ ঢালকা নগর লেন,
গেন্ডারিয়া, ঢাকা
২১ জুন ২০২১

ভূমিকা

ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ। কথাটি এডওয়ার্ড হালেট কারের। এই সংলাপ আমাদেরকে বর্তমান থেকে অতীতে হারাতে বলে না। বরং অতীতকে বর্তমানে এনে ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশ করে। কারণ আমাদের বর্তমান অতীতের নিশ্বাস থেকে বেরিয়ে বিশেষ অবয়ব লাভ করেছে। ফলত বর্তমানকে বুঝে তার লাগাম হাতে নিতে হলে অতীতকে না বুঝে এগোনো যায় না। আর ভবিষ্যৎ আপন হাতে তারাই সাজাতে পারে, বর্তমানের উত্থান-পতনের শাহরগে যাদের হাত!

ডাচ ইতিহাসবিদ জন হুজিংগা অতএব বলেন, ইতিহাস হলো সেই বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন, যাতে কোনো সভ্যতা নিজেই তার উত্থান-পতনের অতীত ব্যাখ্যা প্রদান করে।

এর মানে সত্যিকার ইতিহাস ভুলে গেলে আমাদের 'আজ' যেমন 'আমাদের' হবে না, তেমনই হারাব আগামীকালকেও। ইতিহাস নিজেই এক বারুদ এবং বারুদের গুদামঘর। এ কোনো প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রত্নতত্ত্ব নয়। এ এক অনিরুদ্ধ স্রোত, এক স্বাধীনতা এবং জীবনের নবনির্মাণ। কিন্তু সে কেবল মানুষের যাপনের বয়ান নয়। সে সময়ের, স্থানের এবং মানুষের সমন্বিত চিত্র ও চরিত্রের স্মারক। তার কেন্দ্রীয় আলোচ্যবিষয় মানুষ, সভ্যতা ও মানুষের পৃথিবী। ফলত মানুষ ও তার কর্মকাণ্ড এখানে হাজির হয় নিরন্তর। সমাজ-সভ্যতা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, যুদ্ধ, আইন ইত্যাদির ধারাক্রম ভেসে উঠতে থাকে সেলুলয়েডের ফিতার মতো। ইতিহাস এসবের শুধু অবগতি দেয় না, বরং এসবের ভালো-মন্দ পার্থক্য করা এবং বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাও সরবরাহ করে।

ইতিহাসের একান্ত প্রয়োজন যথার্থতা, বস্তুনিষ্ঠতা। যার মধ্যে থাকবে অতীতে আসলেই যা ঘটেছিল, তারই ইতিবৃত্ত। মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ ঘটনাচক্রের ভেতর-বাইরের স্বরূপ প্রকটিত হবে তাতে। আরবিতে ইতিহাসকে বলে তারিখ। এর মানে হলো, সময়ের পরিচয়দান, সময় বিষয়ক তথ্যদান। আরব ঐতিহাসিকরা একে দেখেন এমন এক শাস্ত্র হিসেবে, যাতে বিভিন্ন গোত্র, বংশ, ভূখণ্ড ও ব্যক্তিদের ঘটনাবলির বিবরণ ও বিশ্লেষণ থাকে। বা যাতে বিশ্বের ঘটনাচক্রের দিনকাল যাচাই ও বিবৃত হয়।

জানা কথা যে, গ্রিক শব্দ Historia থেকে এসেছে History। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬০-৫৪৬) তার গবেষণাকর্মের শিরোনামে শব্দটি ব্যবহার করেন প্রথমে। এর অর্থ হলো সত্যের অনুসন্ধান ও তদন্ত। বাংলায় ইতিহাস শব্দটির উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'ঐতিহ্য'। 'ইতিহ'-এর সাথে 'আস' মিলে হয়েছে ইতিহাস। এর মানে হলো, এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল। অর্থাৎ ইতিহাস হচ্ছে, অতীতের এমন বিবরণী, যা আসলে এমনই ছিল, যেমন আছে বিবরণে। ঐতিহ্য বা সুকৃত অতীত ও এর পক্ষ-প্রতিপক্ষের কালো-ধলো, রূপ-রূপান্তর দৃশ্যমান হবে সেই বিবরণে।

আধুনিক ইতিহাসের জনক বলে পরিচিত লিউপোল্ড ভন রাংক তাই ইতিহাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, যা আসলেই ঘটেছিল, তাকে খুঁজে বের করা এবং তার সঠিক বিবরণই হচ্ছে ইতিহাস।

ইতিহাসের পাঠকমাত্র জানেন, ইতিহাস অধ্যয়নকে দুই ভাগে ফেলা যায়। একটি ভৌগোলিক অবস্থানগত, অপরটি বিষয়বস্তুগত। ইতিহাসের উপাদান হচ্ছে সেই সব লিখিত-অলিখিত তথ্য-প্রমাণ, যার ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

যেভাবেই বলি না কেন, ইতিহাস আসলে এক অনুসন্ধানী ধারা। আই, আর ফ্লিন্ট এবং সি এইচ ওমান-এর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায়, এ এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, যার উদ্দেশ্য মানুষের কার্যাবলি লিপিবদ্ধ করা। এ প্রচেষ্টা যেকোনো জাতি ও সভ্যতার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাস আমাদের কীভাবে সমৃদ্ধ করে?

ইবনুল আসির লেখেন, পূর্ববর্তী লোকদের জীবন ও কর্মকে মনে করিয়ে দেয় ইতিহাস। ক্ষতিকর দিকগুলোকে ধরিয়ে দেয়, কল্যাণকর বিষয়সমূহকে অবলম্বন করতে শেখায়। ব্যবসাবাণিজ্যসহ নানাক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে সমৃদ্ধ করে আমাদের। বস্তুত সে বিকাশ ঘটায় বুদ্ধিবৃত্তির। এর মাধ্যমে জমিয়ে রাখা যায় মানুষের মজমা।

এই যে মানুষের মজমা জমিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানো, অতীতের বহু প্রজন্ম ও শতাব্দীর অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করা, এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইতিহাস নিজেদের পরিচয় ও শিকড়কে সংরক্ষণ করে। আধিপত্যবাদী প্রতিটি জাতি ও রাষ্ট্র চায়, অন্য জাতিসমূহের পরিচয় ছিনতাই করতে, শিকড় কেটে ফেলতে। এটি করতে পারলে সংশ্লিষ্ট জাতি যেমন প্রাণশক্তি হারাবে, তেমনই সে মনের দিক থেকে হতে থাকবে অন্যের অধীনস্থ। এদের দাস বানানোর জন্য আর যুদ্ধ করা লাগে না, স্বেচ্ছায় তারা বরণ করে নেয় অন্যের দাসত্ব, গোলামি। এর মধ্যে কল্পনা করে মুক্তি ও আরাম। নিজেদের ইতিহাসের সত্যিকার রূপ প্রজন্মের সামনে হাজির না থাকার বিপদ হলো, তারা কেবল অজ্ঞতার মধ্যে থেকে যায়, তা নয়, তারা পরানুকরণ ও হীনম্মন্যতায় ডুবে যায়। ফলত ইতিহাসের সত্যিকার অনুসন্ধান কেবল জ্ঞানগত প্রয়োজনে অপরিহার্য তা নয়, দেশ ও মিল্লাতের মুক্তি ও অগ্রগতির জন্যও এটি আবশ্যক।

এ বহুমাত্রিক প্রয়োজন পূরণে ইতিহাসের চর্চায় মুসলিম মনীষীদের বিচরণ কোনোকালেই সীমিত থাকেনি। সেই হিজরি প্রথম শতকে উরওয়া ইবনে জুবাইর (৭১২), আবান বিন ওসমান ইবনে আফফান (৭২৩), ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রা. (৭৩৫) ছিলেন এ ধারার নেতৃত্বে। এর পরে দেখব ইবনে শিহাব জুহরি (৭৪১), মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (৭৬১), আবু মিখনাফ (৭৭৪), হিশাম ইবনে কালবি (৮১৯), আল-ওয়াকিদি (৮২৩), ইবনে হিশাম (৮৩৫), ইবনে সাদ (৮৪৫), খালিফা ইবনে খাইয়াত (৮৫৪), ইবনু আবদিল হাকাম (৮৭১), ইবনে কুতাইবাহ (৮৮৯), আদ-দিনাওয়ারি (৮৯১), বালাজুরি (৮৯২), ইয়াকুবি (৯০০), ইবনে ফাদলান (৯২২), মুহাম্মদ ইবনে জারির আত-তাবারি (৯২৩), আবু মুহাম্মদ হাসান আল-হামদানি (৯৪৫),

আবু বকর ইবনে ইয়াহইয়া আসসুলি (৯৪৬), আলি আল-মাসউদি (৯৫৫), সিনান ইবনে সাবিত (৯৭৬), কাজি আন-নুমান (৯৭৪), ইবনুল কুতাইয়া (৯৭৭), আসসাগানি (৯৯০) প্রমুখ। এগুলো প্রথমদিককার বিভিন্ন ধারার মুসলিম ঐতিহাসিকদের সকল নাম নয়, অগ্রগণ্য কিছু নাম।

পরবর্তী অগ্রগণ্যদের মধ্যে দেখব আল-মুকাদ্দাসি (১০০০), ইবনুল ফারাদি (১০১২), ইবনে মিশকাওয়াহ (১০৩০), আল-উতবি (১০৩৬), আল-মুসাব্বিহি (১০৩০), আল-বিরুনি (১০৪৮), হিলাল ইবনে আল-মুহাসসিন আস-সাবি (১০৫৬), ইবনে হাজম উন্দুলুসি (১০৬৩), ইউসুফ ইবনু আবদিল বার (১০৭১), খতিবে বাগদাদি (১০৭১), আবুল ফজল বায়হাকি (১০৭১), জাহিরুদ্দিন নিশাপুরি (১১৭৫), ইবনে হাইয়ান (১০৭৫), আল-উরদি (১০৮৫), আবু উবাইদ আবদুল্লাহ আল-বাকরি (১০৯৪), কাজি ইয়াজ (১১৪৯), ইবনুল কালানিসি (১১৬০), মুহাম্মদ আল-বাইদাক (১১৬৪), ইবনে আসাকির (১১৭৬), উসামা ইবনে মুনকিজ (১১৮৮), ইবনে রুশদ (১১৯৮), ইমামুদ্দিন ইসফাহানি (১২০১), আবুল ফারজ ইবনুল জাওজি (১২০১), আবদুল লতিফ বাগদাদি (১২৩১), ইয়াকুত হামাবি (১২২৯), ইবনুল আসির (১২৩১), বাহাউদ্দিন ইবনে শাদ্দাদ (১২৩৫), মিনহাজ উস-সিরাজ (১২৬০ পরবর্তী), ইবনুন নাদিম (১২৬৯), আবু শামা (১২০৩ থেকে ১২৬৮-এর মধ্যে), ইমাম কুরতুবি (১২৭৩), আবদুল আজিজ আল-মালজুজি (১২৯৮), ইবনু খাল্লিকান (১২৮২), ইবনু আবদিল জাহির (১২৯৩), মুহাম্মদ ইবনে আলি রাওয়ান্দি (১১৭৯-১২২৯), জাহিরুদ্দিন নসর মুহাম্মদ আওফি (১২৪৯), সিবত ইবনুল জাওজি (১২৫৬), হামদুল্লাহ মুস্তাওফি (১২৮১), ইবনে বিবি (১২৮১-এর পরে), আতা মালিক জুওয়াইনি (১২৮৩), ইবনুত তিকতাকা (১৩০২), ইবনে ইবহারি (১৩১২), ইবনে বতুতা (১৩৬৯), ইবনুল খাতিব (১৩৭৪), ইবনে আবি জার (১৩২০), ইবনুল ফুওয়াতি (১৩২৩), ওয়াসসাফ (১৩২৩), আমির খসরু (১৩২৫), আবুল ফিদা (১৩৩১), আন-নুওয়াইরি (১৩৩২), আল-মিজজি (১৩৪১), আজ-জাহাবি (১৩৪৮), জিয়াউদ্দিন বারানি

(১৩৫৭), ইবনে খাতির (১৩৭৩), রাশিদুদ্দিন হামদানি (১৩৯৮), ইবনুল ফুরাত (১৪০৫), আল-মাকরিজি (১৪৪২), ইসমাইল ইবনে আল-আহমার (১৪০৬), ইবনে খালদুন (১৪০৬), ইবনে হাজার আসকালানি (১৪৪৯), শরফুদ্দিন আল-ইয়াজদি (১৪৫৯), বদরুদ্দিন আইনি (১৪৫১), ইবনে তাগরি বিরদি (১৪৭০), আশিকপাশা জাদে (১৪৮১), তুরশুন বেগ (১৪৮৮ পরবর্তী), মির খোন্দ (১৪৯৮), ইমাম সাখাবি (১৪৯৭), জালালুদ্দিন সুয়ুতি (১৫০৫), ইদরিস-ই বিতলিসি (১৫২০), ইবনে ইয়াস (১৫২২), মুজিরুদ্দিন উলাইমি (১৫২২), জহিরুদ্দিন বাবর (১৫৩০), মুহাম্মদ খাওয়ান্দা মির (১৫৩৫), মাতরাকই নাসুহ (১৫৬৪), হুকা সাদেদ্দিন এফেন্দি (১৫৯৯), মোস্তাফা আলি (১৬০০), মোস্তাফা সেলানিকি (১৬০০), আবুল ফজল আল্লামি ইবনে মুবারক (১৬০২), আবদুল কাদির বাদায়ুনি (১৬১৫), আবুল কাশেম ফেরেশতা (১৬২০), নিজামুদ্দিন আহমদ (১৬২১), আহমদ মুহাম্মদ আল-মাক্কারি (১৬৩২), ইস্কান্দার বেগ মুনশি (১৬৩২), খাতিব চেলেবি (১৬৪৭), ইবরাহিম পেচেবি (১৬৫০), মোস্তাফা বিন আবদুল্লাহ হাজ্জি খলিফা (১৬৫৬), ইনায়েত উল্লাহ কামবুহ (১৬৭১), মুহাম্মদ সালেহ কামবুহ (১৬৭৫), ইভিলিয়া চেলেবি (১৬৮২ পরবর্তী), আবুল ফজল মামুরি (১৭০০) মোস্তাফা নাইমা (১৭১৬), সিলাহদার ফিন্দিকলিলি মেহমেদ আগা (১৭২৩), মুহাম্মদ আল-ইফরানি (১৭৪৭), মির্জা মেহদি খান আস্তারাবাদি (১৭৬০), মুহাম্মদ আল-কাদেরি (১৭৭৩), আহমেদ রেশমি এফেন্দি (১৭৮৩), খলিল আল-মুরাদি (১৭৯১), গোলাম হোসাইন সলিম (১৮১৭), আবদুর রহমান আল-জাবারতি (১৮২৫), আহমেদ চেভদেত পাশা (১৮৯৫), আহমদ ইবনে খালিদ আন-নাসির (১৮৯৭) থেকে নিয়ে শিবলি নোমানি (১৯১৪), স্যার সৈয়দ আমির আলি (১৯২৮), আল্লামা সোলায়মান নদবি (১৯৫৩), মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া (১৯৭৫), মেহের আবদুল হক (১৯৯৫), সৈয়দ শামসুল্লাহ কাদরি (১৯৫৩), রহমত ফরুখাবাদি (১৯৯৩), খালিক আহমদ নেজামি (১৯৯৭) বাহিত ইতিহাসবিদদের যে ধারা, তা এখন জারাফুল ইসলাম ইসলাহি, ইরফান হাবিব, এহসানুল করিম, মোবারক আলি, ইসমাইল

রেহান, সুহাইল তাক্কুশ, আলি আস-সাল্লাবি, রাগিব সারজানি, গোলাম আহমদ মোর্তজাসহ বিপুলসংখ্যক সৃষ্টিশীল হাতের বিচিত্র বুননে ঋদ্ধ ও গতিমান।

বাংলাদেশে মুসলিমদের ইতিহাসচর্চার ধারা কম গতিমান নয়। তেমন পেছনে না গেলেও আমরা দেখি, কদিন আগেই এখানে ইতিহাসচর্চা করেছেন মোহাম্মদ আবদুর রহিম (১৯৮১), আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯৮৪), কে. আলী (১৯৯৯), এম. আকবর আলী (২০০১), মুহাম্মদ ইসহাক (২০০৫), আবদুল করীম (২০০৭), মোহাম্মদ মোহর আলী (২০০৭), আহমদ হাসান দানী (২০০৯), ড. আশকার ইবনে শাইখ (২০০৯), আবদুল মান্নান তালিব (২০১১), এ এফ সালাহুদ্দীন আহমদ (২০১৪), মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (২০১৪), এবিএম হোসেন (২০২০) ও একেএম মোহসিন (২০২১) প্রমুখ।

এ সময়ে এখানে ইতিহাসচর্চায় এগিয়ে আছেন দেওয়ান নুরুল আনোওয়ার হোসেন, এবনে গোলাম সামাদ, মাহবুব সিদ্দিকী, গোলাম মুর্শেদ, আকবর আলি খান, ড. মোহাম্মদ হান্নান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, মুনতাসির মামুন, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, কে এম রইছউদ্দীন খান, সরদার আবদুর রহমান, মোহা. মোশাররফ হোসাইন, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাহাদত হোসেন খান প্রমুখের কলম। উঠে আসছেন নবীন কিছু ইতিহাসলেখকও।

বাংলায় মুসলিমদের ইতিহাসচর্চার এ ধারায় আলেমদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মওলানা মনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী থেকে মওলানা আকরম খাঁ হয়ে এ স্রোত বহমান। এতে নবতর এক শক্তিমান সংযোজন মাওলানা মনযূর আহমাদ। *সিন্ধু থেকে বঙ্গ* গ্রন্থ হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন ইতিহাসের দরোজায়। দায়বোধের একান্ত নির্দেশে সক্রিয় তার কলম। ভারত উপমহাদেশে ইসলামের উদয়, বিকাশ, প্রসার ও গণজীবনে তার নিবিড়-গভীর আবেদনের ইতিবৃত্তে তিনি নজর দিয়েছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের বিস্তার, প্রভাব ও বিপ্লবাত্মক ক্রমধারাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন। মুসলিম শাসকদের কর্ম ও কৃতিত্ব যেমন তিনি উল্লেখ করেন, তেমনই তাদের প্রতি আরোপিত নানা

অভিযোগের ওপরও আলোকপাত করেছেন। ইতিহাসপাঠ ও ইতিহাস উপলব্ধির বিদ্যমান যে পরিসর, মনযূর আহমাদের অবস্থান এর মধ্যে। তিনি এই পরিসরে স্থিত হয়ে কথা বলেন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকারদের ভাষা ও বিভূতির সাথে সংগতি রেখে। ফলত চর্চা ও চর্যায় যে মূলধারার যাত্রা, সেখানেই দেখা যায় তার পদপাত।

ইসলামি ও আধুনিক দৃষ্টিকোণের যৌথতাকে যথাসম্ভব ধরে রাখার কোশেশ এ বইকে দেয় বিশেষ মাত্রা। যেসব গ্রন্থ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, সেদিকে তাকালে এটা সহজেই বোঝা যায়। এক ফ্রেমে সিন্ধু থেকে বঙ্গকে এভাবে হাজির করা আসলেই এক ব্যতিক্রমী ও সাহসী প্রয়াস। বিশেষত ইসলামি ভাবধারার পাঠকরা এ বইয়ে আস্বাদন করবেন সেই সত্যস্বাদ, যার অপেক্ষা তাদের মনে জাগ্রত। কিন্তু সাধারণ পাঠকদের জন্য এ বই স্বতন্ত্র গুরুত্ব রাখবে। কারণ তাদেরই পাঠ্যপুস্তকের চেনা পাঠপদ্ধতিতে এ বই শুনিয়েছে এমন কিছু ইতিবৃত্ত, যার অভাবে তারা সাদা ও কালোর ভেদরেখা ধরতে অনেক সময় ভুল করেন।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এ বই সত্য উন্মোচনের একটি নিবেদিত প্রয়াস। হ্যাঁ, ইতিহাস তো সে প্রয়াসেরই এক দায়িত্বশীল, চিন্তা, তথ্য ও বর্ণনাশৃঙ্খলা। মনযূর আহমাদের বই সেই শৃঙ্খলার মধ্যে সমর্পিত। এখানেই তার ঋদ্ধি।

বইটি পাঠকের জন্য এমন এক উপহার, যা উপমহাদেশে মুসলিম সভ্যতার অতীতের সাথে তার সংলাপ ও সংযোগকে স্বচ্ছ ও সত্যসন্ধ করবে। ফলে এর গুরুত্ব শুধু আজ নয়, আগামীকালও জারি থাকবে এবং বেড়ে চলবে।

মুসা আল হাফিজ

২১ মার্চ, ২০২১

সেন্টার ফর ইসলামিক থট এন্ড স্টাডিজ, ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

শিকড়ের ইতিহাস

ইসলামের ইতিহাস সূচিত হয়েছে মানবসভ্যতার প্রথম প্রকাশ—আদম আ.-এর যুগ থেকে। আদম আ. থেকে নুহ আ. পর্যন্ত এর বিকাশের প্রথম যুগ। নুহ আ. থেকে কুলপতি ইবরাহিম আ.-এর সময় পর্যন্ত নানা উপযোগী বিবর্তনের পর মুসা আ.-এর যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তা একটি বিধিব্যবস্থা-সংবলিত অঞ্চলগ্রাহ্য শরিয়তের রূপ ধারণ করে। এ সময় বনি ইসরাইল জাতির স্বাতন্ত্রিক সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। ইসলামের প্রথম স্মারকগৃহ বাইতুল্লাহ মক্কার মরুপ্রান্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত হয় এই সময়।

কিন্তু তখনও অপেক্ষাকাল অতিবাহিত হয়নি। ইবরাহিম আ.-এর মুনাজাত, ঈসা মসিহ আ.-এর খোশখবর এবং অথর্ববেদের সেই 'রাসুলবর' তখনও বাস্তবরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেননি।

ইবরাহিম আ.-এর মুনাজাত

﴿وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

স্মরণ করুন (সেই সময়ের কথা), ইবরাহিম যখন (কাবা) গৃহের প্রাচীরগুলো (গেঁথে) তুলছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে (ছিলেন) ইসমাইল; (তারা প্রার্থনা করেছিলেন,) হে আমাদের

প্রভু, আমাদের (এই সেবা) আপনি কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা! আর, হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়কে আপনি আপনার প্রতি (নিবেদিতচিত্ত) রাখুন এবং আমাদের বংশ থেকে এমন উম্মত তৈরি করুন, যারা আপনার একনিষ্ঠ তাবেদার হবে। আমাদের ইবাদতের নিয়ম শিখিয়ে দিন। আমাদের তওবা কবুল করুন। নিঃসন্দেহে কেবল আপনি মহাক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

হে আমাদের প্রভু, তাদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসুল অভ্যুত্থিত করুন, যে তাদের নিকট আপনার আয়াত তেলাওয়াত করবেন আর তাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিকমত এবং তাদের পবিত্র করে তুলবেন। নিশ্চয় আপনি প্রবল প্রজ্ঞাময়। [সুরা বাকারা : ১২৭-১২৯]

ঈসা আ.-এর খোশখবর

﴿وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ﴾

এবং মরিয়ম-তনয় ঈসা যখন বলেছিলেন : হে বনি ইসরাইল, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি আল্লাহর রাসুলরূপে। আমার সম্মুখে তাওরাতের যে অংশ (বিদ্যমান) আছে, তা সত্যায়ন করার জন্য এবং আমার পরে আহমদ নামে একজন আসছেন, তাঁর সম্বন্ধে 'সুসমাচার' দেওয়ার উদ্দেশ্যে; কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত রাসুল যখন উজ্জ্বল দলিল-প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে সমাগত হলেন, তখন তারা বলল, এগুলো স্পষ্টত জাদুর ব্যাপার। [সুরা সাফ : ৬]

কালক্রমে অপেক্ষার প্রহর অতিবাহিত হলো এবং আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে মক্কার এক বিধবা মায়ের পর্ণকুটিরে আবির্ভাব হলো সেই যুগে যুগে কাঙ্ক্ষিত, দেশে দেশে নন্দিত মহামানবের—এক এতিম শিশুরূপে।

ইহুদি ও বনি ইসরাইল

ইহুদি জাতি তাদের নবিগণের দ্বারা বহুবার অভিশপ্ত হয়েছেন তাদের কাপুরুষতা ও অবাধ্যতার জন্য। এই শ্রেণির অবাধ্যতা ও অনাচারের ফলে দুনিয়ায় তাদের বহুবার নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। মুসা আ.-এর তিরোধানের পর তাদের দুর্দশা ও দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। বলা আবশ্যক, জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়ার কারণেই শত্রুরা বিভিন্ন সময় তাদের ওপর আক্রমণ শানাতে থাকে, তাদের সপরিবারে গোলাম করে রাখে; অনিঃশেষ প্রকারের নিষ্ঠুর যাতনা দিতে থাকে। শত্রুরা বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভেঙে ধূলিসাৎ করে; ধর্মীয় সাহিত্যগ্রন্থসমূহ পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলে।

এমন অবস্থায় তারা একসময় নিজেদের নবির নিকট উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করতে থাকে, আমাদের জন্য একজন রাজা নির্বাচন করে দিন, যেন তার নেতৃত্বাধীন আমরা শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ করতে পারি! নবি ভর্ৎসনা করে বললেন, আবার তো তোমরা আগের মতো নাফরমানি করবে! অনেকবার অঙ্গীকার করার পর তখনকার নবি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তালুত নামক একজন জ্ঞানী বীরপুরুষকে তাদের রাজারূপে নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু এবারও তাদের অধিকাংশ তাকে অমান্য করল ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যিকার মুমিন ছিল যে অল্পসংখ্যক লোক, তারা হুংকার দিয়ে বলল, সংখ্যালঘু দল তো বহুবার সংখ্যাগুরু দলকে আল্লাহর হুকুমে পরাজিত করেছে। এই বলে তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পরিণামে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফিরদের পরাজিত করল। এমনকি তাদের প্রধানতম দুশমন জালিম রাজা জালুত দাউদের হাতে নিহত হলো।

সুরা বাকারার ২৪৯–২৫০ আয়াত পাঠ করলে স্পষ্ট জানা যাবে যে, তালুত বাদশার আমলের প্রথম পরীক্ষায় বনি ইসরাইল সমাজ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক দল ছিল আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী, নবির বাধ্য ও আমিরের অনুগত বীর মুমিন-মুসলিম এবং আরেক দল ছিল তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত—অবিশ্বাসী, কাপুরুষ, নবির অবাধ্য ও আমিরের অননুগত।

আফগান বনি ইসরাইল

আফগানিস্তানের লোকেরা দাবি করেন যে, তারা হচ্ছেন তালুতের সহকারী ও সাহায্যকারী মুমিনদের বংশধর—বনি ইসরাইল; ইহুদি তারা নন। অবাধ্য, অনাচারী ও মুনাফিক-দলই বর্তমানে ইহুদি নামে আখ্যায়িত। আফগানিদের এই দাবির পক্ষে ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের জন্য যেসব যুক্তি-প্রমাণের দরকার, তার সবগুলো তাদের জাতীয় সাহিত্যে বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত আছে।

এবার আমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। পবিত্র কোরআনে তালুতকে বনি ইসরাইলের মালিক বা বাদশাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের যারা আল্লাহর নবির নির্দেশ অনুসারে তালুতের বাধ্যগত থেকে জাতীয় বৈরীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, অবশেষে জালুতকে হত্যা করে স্বজাতিকে মুক্তি দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তারা অবাধ্য ইহুদি সমাজের সংস্রব ত্যাগ করে নিজেদের বনি ইসরাইল বলে আখ্যাত করেন। বিজয়ী ও রাষ্ট্রের অধিকারী তালুতের স্বজন ও সন্তানসন্ততি হিসেবে তারা ‘মালিক’ উপাধিও গ্রহণ করলেন। পক্ষান্তরে তারা ইহুদি আখ্যাকে ঘৃণার সঙ্গে বর্জন করেন।

কিন্তু তালুতের পর বনি ইসরাইলের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হতে থাকল। তাদের প্রধান ইবাদাতগাহ বিধ্বস্ত করা হলো, ধর্মীয় কিতাবাদি প্রায় সব ভস্মীভূত হলো এবং বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে তাদের জাতির প্রায় সমস্ত নারী-পুরুষ বিভিন্ন জালিম বাদশাহ কর্তৃক হয় স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হলো, না হয় বন্দি হিসেবে অতিনিষ্ঠুর দাস জীবনযাপনে বাধ্য হলো। অথচ তারা এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ও প্রতিকারের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

এই চরম দিশাহারা অবস্থায় বনি ইসরাইলের মধ্যে সুমতির উদ্রেক হয়। তাদের সমাজের কয়েকজন বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তি এর বিহিত সম্বন্ধে ভাবতে প্রবৃত্ত হন।

এই সময়কার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু দেশের বহু পর্যটক ও ঐতিহাসিক বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। এখানে *ভারতীয়*

উপমহাদেশের ইতিহাস : মধ্য ও আধুনিক যুগ-এর সূত্রে 'তারিখে খানজাহান' থেকে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে :

মর্মার্থ : পারস্যরাজ বখতে নসর যখন বনি ইসরাইলকে, আসফের সন্তানবর্গকে ও আফগানের আওলাদদের শাম দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত করে, তখন তাদের কতক লোক পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে স্থির করেন, আমরা দাউদ আ. ও সোলায়মান আ.-এর খোদার ঘর বাইতুল মুকাদ্দাসের জিয়ারত ও সেখানে ইবাদাত করা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমরা অধিকারহারা হয়েছি। কিন্তু ইবরাহিম আ. ও ইসমাইল আ. যে বাইতুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন এবং যে পবিত্র ভূ-ভাগ আল্লাহর শেষ নবির আবির্ভাবের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে, আমরা সকলে সেই আরবদেশে গমন করব। আমাদের এই সুযোগ উপেক্ষা করা সংগত হবে না। সেই নবির সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ যদি আমাদের নাও ঘটে, তা হলে আমাদের সন্তানসন্ততিবর্গ তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হতে পারবে।

এই সিদ্ধান্তের পর এই পক্ষের বহু লোক মক্কা ও তার আশপাশে বসতি গড়ে তোলেন। আরবরা এদের বনি ইসরাইল বা বনি আফগান বলে সম্বোধন করতেন।[১]

---

১. তাওয়ারিখে খানজাহান : ২য় অধ্যায়, পৃ. ৭৭। (স্মরণযোগ্য যে, সূত্রে উল্লেখিত মূলগ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য বলে এবং এই অংশের পিডিএফ ভার্সন অস্পষ্ট হওয়ার কারণে এর যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।) তবে ২৭ মে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের জাতীয় *দৈনিক জং*-এ প্রকাশিত হামিদ মিরের এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে : আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শায়েখ আতাউল্লাহ আল্লামা ইকবালের সাড়ে চার শতাধিক পত্র 'ইকবালনামা' নামে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি প্রথম ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ইকবাল একাডেমি পাকিস্তান তা পুনঃপ্রকাশ করেছে। এ গ্রন্থে খালেদ খলিলের নামে ইকবালের একটি পত্র রয়েছে, যেখানে তিনি পশতুভাষী আফগান ও পাঠানকে একই বলে অভিহিত করে বলেছেন, আফগান মূলত বনি ইসরাইল বংশোদ্ভূত জাত। যে কারণে পশতু ভাষায় হিব্রু ভাষার প্রচুর শব্দ রয়েছে।

আফগান শুধু তারাই নয়, যারা আফগানিস্তানে থাকে, বরং আফগান পাকিস্তানেও বসবাস করে, যাদের পাখতুন ও পাঠান বলা হয়। ড. মুহাম্মদ নওয়াজ খান মাহমুদ তার 'ফিরিঙ্গি রাজ আওর গাইরাতমান্দ মুসলমান' গ্রন্থে লিখেছেন—আফগান, পশতুন বা পাঠানের বংশধারা বনি ইসরাইল তথা হজরত ইয়াকুব আ. থেকে উদ্ভূত। তাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল আফাগেনা, যিনি বনি ইসরাইলের বাদশাহ তালুতের পৌত্র ছিলেন। [গ্রন্থকার]

এভাবে সোলায়মান আ.-এর তিরোধানের পনেরো শত বছর পরে আরবে শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে। এরপর আরও বহু গোত্র বনি ইসমাইল ও আরবদের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আরবদেশে গমন করেন। মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ছিলেন এদেরই উত্তর পুরুষ। তার পুরো নাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ মাখজুমি রা.।[২]

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে আফগানিস্তানের অধিবাসীরা ইবরাহিম আ. প্রতিষ্ঠিত বাইতুল্লাহ সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন কোন সূত্রে ও কী উপায়ে? এর জবাব হচ্ছে :

১. সুরা আলে ইমরানের ৯৫ নম্বর আয়াতে মক্কাকে বাক্কা বলে উল্লেখিত হয়েছে। মক্কা বা বাক্কা উভয় নাম আরবদের মাঝে প্রচলিত ছিল।[৩] বনি ইসরাইলের ধর্মগ্রন্থে একে বাক্কা নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

এই বাক্কা বা মক্কার খোদার ঘরের মহিমা সম্বন্ধে জবুর গীতসংহিতায় দাউদ আ. উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলছেন :

তারা ধন্য, যারা তোমার গৃহে বাস করছে। তারা সতত তোমার তাসবিহ জপ করতে থাকবে। ধন্য সে, যাকে তুমি নিজ সন্নিধান হতে সাহায্য করেছ। তোমার পথগুলো যার অন্তরে নিহিত আছে—বাক্কার সমতলভূমিতে, যে স্থানে তুমি তাকে স্থাপন করেছ। কারণ নিদর্শন ও স্মারকস্মৃতির প্রতিষ্ঠাতা তাকে বরকত দান করবেন।[৪]

২. ইসমাইল আ.-এর ইতিকথা তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। ইবরাহিমের পুত্র কুরবানি করার বিবরণ উল্লেখ করার পর তাওরাতের আদি পুস্তকে বলা হয়েছে : তখন আল্লাহ বালকটির রব শুনলেন, আর আল্লাহর দূত আকাশ থেকে হাজেরাকে ডেকে বললেন, হাজেরা, তোমার কী হলো! ভয় করো না... তুমি উঠে বালকটিকে

---

২. উসদুল গাবা (পৃ. ২-১০১) ইত্যাদি বহু নির্ভরযোগ্য পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩. রাগিব ও ফুতুহুল বুলদান প্রভৃতি।

৪. জবুর গীতসংহিতা : ৮৩ : ৪-৬।

তুলে ধরো। কারণ, আমি তাকে মহাজাতি করব। তখন তার চোখ খুলে দিলেন। তখন সে এক সজল কূপ দেখতে পেল... পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হলেন। সে বড় হয়ে উঠল এবং প্রান্তরে থেকে ধনুর্বর হলো। সে ফারান প্রান্তরে বসতি স্থাপন করল।[৫]

এরপর সদা প্রভু ইবরাহিমকে আরেক পুত্রের সুসংবাদ দিলেন। কিন্তু নিজের বার্ধক্যের উল্লেখ করে একটু হতাশার ভাবে সদাপ্রভুকে বললেন, ইসমাইল তো আমার গোচরে বেঁচে থাকুক। এইসব কথা শোনার পর প্রভু ইবরাহিমকে বললেন, আমি ইসমাইলের বিষয়ে তোমার কথা শুনলাম। দেখো, আমি তাকে আশীর্বাদ করলাম এবং তাকে কর্মবান করে তার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করব। তাকে বহু বহু অনুগ্রহ দান করলাম এবং তার থেকে বারোজন ইমাম (খলিফা) উৎপন্ন করব।[৬]

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, বনি ইসরাইল সমাজ তাদের পুস্তকগুলো থেকে মক্কার ঘর বাইতুল্লাহ, ইসমাইল ও তার সহযাত্রী স্বজাতীয়গণ সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন। এ বিষয়ে তাওরাত, ইনজিল ও বনি ইসরাইলের ইতিহাসে আরও অনেক তথ্য আছে।

মনে রাখতে হবে, আফগানিস্তানকে সাধারণ পাঠান জাতির আবাসভূমি বললে অত্যুক্তি করা হয় না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীরা আজও নিজেদের আবাসভূমিকে পাখতুনিস্তান বা পাঠানিস্তান বলে পরিচয় দান করেন। অন্যান্য সমস্ত দেশের মতো পাঠান ও আফগান ব্যতীত অন্যান্য কওমেরও কিছুসংখ্যক যে ওই দেশে বসবাস করে তাও সত্য। কিন্তু অনুপাতে পাঠানদের সংখ্যা অধিক।

বনি ইসরাইল বারোটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তালুত বা সাওলের পূর্ববর্তী সময় হতে তাদের দশটি গোত্রের লোকদের ধার্মিকতা ও নৈতিকতায় পতন ঘটতে থাকে। সেজন্য তালুত বাদশার ও তার সামসময়িক নবির আদেশ-নিষেধ অমান্য করার ফলে তারা একটি

---

৫. জবুর গীতসংহিতা : অধ্যায় ২১।

৬. আদি পুস্তক, অধ্যায় ১৭।

অভিশপ্ত জাতিরূপে পরিগণিত হতে থাকে। এরপর অন্য দুটি গোত্র যারা ছিলেন মুমিন-মুসলিম এদের সাথে আর তাদের কোনো সংস্রব থাকে না। পবিত্র কোরআনে বনি ইসরাইলকে বারো গোত্রে চিহ্নিত করলেও ইহুদিদের দাবিমতে তাদের গোত্র মাত্র দশটি। তাদের যে দুটি গোত্র অবিশ্বাসী ও অবাধ্য দশ গোত্রকে ত্যাগ করেছিল, এদের তারা নিজেদের বা ইহুদিদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে না।

তবে বিশ্বাসী এই দুই গোত্রের লোকেরা নিজেদের তৎকালীন শোচনীয় পরিস্থিতির বিষয়ে কিছুকাল ধরে বিবেচনা করার পর সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত তাদের আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় নেই।

এ প্রসঙ্গে তারিখে *জাঁহাকুশা*, *মাজমাউল আনহার* ও *তারিখে আসনাফুল মাখলুকাত* প্রণেতাগণ লিখেছেন : রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভ আবির্ভাবের পর যখন দুনিয়ার বিভিন্ন দিক নবুয়তের স্বর্গীয় নুরে উদ্ভাসিত হয়েছিল, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন শ্রেণির ও বিভিন্ন স্থানের আরবি লোকেরা তখন দলে দলে মদিনার দিকে ধাবিত হন এবং তারা ইসলামে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য করেন। এই সময় খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. ইসরাইলি, আফগানি ও নিজের গোত্রগোষ্ঠীর লোকদের নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন।

বখতে নসর কর্তৃক বনি ইসরাইল দেশান্তরিত হওয়ার পর তাদের অনেকে আফগানিদের সঙ্গে কোহেস্তান ও গওরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করছিলেন। পত্রে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ শেষ নবির আবির্ভাব, ইসলাম ও ঈমানের ব্যাখ্যা করে তা গ্রহণ করার জন্য এদের আহ্বান জানান। খালিদের পত্র পাওয়ার পর সেই সকল গোত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির একটি দল মদিনায় গমন করার সিদ্ধান্ত নেন। এই আফগানি প্রতিনিধিদলের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ছিল কায়েস।[৭]

---

৭. তারিখে খানজাহানি, খণ্ড ১, পৃ. ১০৭-এর সূত্রে 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' থেকে উদ্ধৃত।

এ প্রসঙ্গে *তারিখে খানজাহানি* প্রণেতা লেখেন :

অতএব সেই কায়েস, যিনি আবদুর রশিদ নামে ও পাঠান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, তিনি সানন্দে ও উৎফুল্লচিত্তে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ৭৮ বছর বয়সে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা.-এর শাসনামলে ইনতেকাল করেন।[৮]

মালাবারে ইসলাম

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চল্লিশ বছর বয়সের পরে—তাঁর নবুয়ত লাভের অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে ইসলামের প্রভাব ও প্রচার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। সততার সঙ্গে এর কার্যকারণ সন্ধান করলে জানা যাবে যে, করুণাময় আল্লাহ তাআলার মঙ্গল ইচ্ছাই ছিল এর মৌলিক প্রেরণা। নানা অবিচারে, কদাচারে, মূঢ়তা ও কুসংস্কারের সূচিভেদ্য অন্ধকারে আল্লাহর সৃষ্টি তখন শোচনীয়তার চরম স্তরে উপনীত হয়েছিল। তাই দয়াময়ের ফরমান এলো—আবার দুনিয়ায় নবতর সৃষ্টির উদ্রেক হোক। প্রথম সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ফারান প্রান্তরের আকাশে-বাতাসে। তাই স্বর্গের আলোকে পুলকিত হয়ে উঠেছিল তাকবিরের সঞ্জীবনী উচ্চারণ—দুনিয়ার দিকে দিকে, যুগপৎভাবে। যে সঞ্জীবনী উচ্চারণ ও আলোকমালা উচ্ছ্বসিত ও উদ্ভাসিত করে তুলেছিল আফগানিস্তান এবং মালাবারকেও। এমনই করে, সেই থেকে আজ অবধি অবিরাম ধারায় সেই আবেহায়াতের স্রোতধারা স্নাত ও স্নিগ্ধ করে বয়ে চলেছে পৃথিবীর জনপদ থেকে জনপদে, অবিরাম গতিতে।

মালাবার দেশ

মালাবারে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ববর্তী লেখকগণের প্রায় সকলে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছেন শেখ জায়নুদ্দিন প্রণীত ‘তোহফাতুল মুজাহিদিন’ গ্রন্থ। সৈয়দ মাওলানা সোলায়মান নদবিও তার

---

৮. তারিখে খানজাহানি, পৃ. ১১২-এর সূত্রে ‘মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’ থেকে উদ্ধৃত।

'আরবুঁকে জাহাজরানি' গ্রন্থে মালাবার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বর্তমান ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের একটি জেলার নাম মালাবার। ভৌগোলিক পরিভাষায় কখনো সম্পূর্ণ উপদ্বীপটিকে মালাবার নামে অভিহিত করা হয়। মলয়+আবার=মালাবার। মলয় মূলত একটি পর্বতের নাম এবং আবার অর্থ কূপকুঞ্জ, জলাশয়। তবে আরবরা সাধারণত একে মাবার বলেন। এর অর্থ, অতিক্রম করে যাওয়ার স্থল—পারঘাট। বর্তমান ভূগোলে যা পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট রূপে চিহ্নিত হয়েছে। যেহেতু আরব বণিক ও নাবিকরা এই ঘাটদুটি পার হয়ে মাদ্রাজে ও হেজাজে যাতায়াত করতেন এবং মিশর থেকে চীন দেশে ও পরিপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগরেবন্দরে ভ্রমণ করতেন, এজন্য তারা এ অঞ্চলটিকে মাবার বলেন।

এই নাম দ্বারা বোঝা যায় যে এই দেশের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও যাতায়াত বহু পুরোনো। এই দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

বস্তুত ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার বহু পূর্ব থেকে বহু আরব এই দেশে আগমন করেছিলেন এবং তাদের বহু লোক এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। ফলত স্বীকার করতে হবে, বিপুল আরব এ দেশে বসতি স্থাপন করার কারণে এর পুরাতন নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এখানকার মুসলিমরা 'মোপলা' নামে পরিচিত। মালাবারের অধিবাসী মোপলাদের সম্বন্ধে বিশ্বকোষে বলা হয়েছে যে এরা অধ্যবসায়শীল, কর্মঠ ও বর্ধিষ্ণু। এদের অবয়ব সুগঠিত ও বলিষ্ঠ। এরা দেখতে সুশ্রী। এদের মতো পরিশ্রমী জাতি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নেই। সাহসিকতায় এরা চিরপ্রসিদ্ধ। এদের অধিকাংশ ধীবর (মৎস্যজীবী) জাতীয়। আরবের সঙ্গে বাণিজ্য এবং স্বদেশি ধীবরদের ইসলামধর্মে দীক্ষা দান এদের প্রধান কর্ম। এরা শ্মশ্রু ধারণ করে এবং কেশ কর্তন করে। সকলে মাথায় টুপি পরে। এরা স্বভাবগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।[৯]

---

৯. বিশ্বকোষ, খণ্ড ১৪, পৃ. ৬১৭।

মালাবারে নির্মিত মসজিদের তালিকা

১. প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় পেরুমলের রাজধানী কর্ণক্লোর বা ক্রাঙ্গানুরে। এটি নির্মাণ করেন মালিক ইবনে দিনার।

২. দ্বিতীয় মসজিদ নির্মিত হয় ত্রিকাঙ্কোড়ের অন্তর্গত কওলাম বা কোল্লামে (বা কুইলেনে)।

৩. তৃতীয় মসজিদ নির্মিত হয় ডিল্লি পর্বতে (বা হিলি মারাওয়াতে)।

৪. চতুর্থ মসজিদ নির্মিত হয় দক্ষিণ কানাডার অন্তর্গত বুর্কবে (বা পাকনুরে)।

৫. পঞ্চম মসজিদ নির্মিত হয় মঙ্গলোর নগরে।

৬. ষষ্ঠ মসজিদ নির্মিত হয় তেল্লিচেরির অন্তর্গত ধর্মপত্তন (বা দরমফদন) নগরে।

৭. সপ্তম মসজিদ নির্মিত হয় বেলুর রেল টার্মিনালের নিকটবর্তী চালিয়াম (বা শালিয়াত) নগরে।

৮. অষ্টম মসজিদ নির্মিত হয় জৈফতন (বা জরমফতনে), যার বর্তমান নাম সুরুকৃণ্ডপুরম। ইবনে বতুতা খ্রিষ্টীয় তেরো শতাব্দীতে লেখা তার ভ্রমণবিত্তান্তে এই মসজিদের নাম উল্লেখ করেছেন।

৯. নবম মসজিদ নির্মিত হয় পন্থারিনিতে (বা ফন্দারিয়ায়)।

১০. দশম মসজিদ নির্মিত হয় কঞ্জরকোট নামক স্থানে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, মসজিদ নির্মিত হওয়ার সাথে সাথে যে এ দেশে মুসলিমদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও বিস্তৃতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। উল্লেখ্য যে এই সমস্ত মসজিদের ব্যয়ভার বহন করার জন্য অনেক সম্পত্তি প্রদত্ত হয়েছিল।

ওই সময় থেকে উপকূলবাসী ও দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ক্রমে তারা সারা রাজ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

সিন্ধু বিজয়

সিন্ধুর ইতিহাস আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাজা দাহির ও মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের কথা ভেসে ওঠে। অথচ সিন্ধু অভিযান ও বিজয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছিল মুহাম্মদ ইবনে কাসিমেরও পূর্বে—**১৫** হিজরির মধ্যভাগে। এখানে কাসিমের পূর্বে আরও কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর কোনো কোনোটিতে মুসলিমরা অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এমনকি একবার সকল মুসলিম সেনা শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

সিন্ধুতে অভিযানের সূচনা ঘটে ওমর রা.-এর খেলাফতের শুরুর দিকে। তা শেষ হয় আলি রা.-এর সময়ে। এই দীর্ঘ ইতিহাসের সারসংক্ষেপ 'ফুতুহুল বুলদান'-এর সূত্রে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা **১৫** হিজরিতে ওসমান ইবনে আবু সাকাফিকে বাহরাইন ও আম্মানের গভর্নর নিয়োগ করেন। এই নিয়োগের পরই ওসমান আপন ভাই হাকামকে বাহরাইনের ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করে নিজে আম্মানে চলে যান। তিনি সেখান থেকে ভারতের সীমান্তের উদ্দেশে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তার অপর ভাই মুগিরাকে দেবল (বর্তমান করাচি) অভিযানে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে মুগিরা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেন।

এরপর তৃতীয় খলিফা ওসমান ইবনে আফফান রা. খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পরে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তখন তাদের দারুল খেলাফত থেকে ভারত সীমান্তে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি কার্যভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই হাকিম ইবনে জাবালাকে তথ্যসংগ্রহ করার জন্য ভারতে প্রেরণ করেন। হাকিম তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করে যথাসময়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং গভর্নরের পরামর্শে কতিপয় সঙ্গীসহ মদিনায় খলিফার নিকট হাজির হন। খলিফা তার নিকট ভারত সীমান্তের খবর জানতে চাইলে তিনি বলেন—

সেখানে পানি প্রচুর, খাদ্যশস্য অপর্যাপ্ত এবং সেখানকার ডাকাতদল দুর্ধর্ষ। যদি সৈন্যসংখ্যা অল্প হয়, তবে তারা নিপাত যাবে। পক্ষান্তরে সৈন্যসংখ্যা অধিক হলে তারা খাদ্যাভাবে নিপাত হতে পারে।

ফলে সিন্ধু অভিযান মুলতবি রাখা হয়। এরপর ৩৮ হিজরি পর্যন্ত ভারত অভিমুখী আর কোনো অভিযান পরিচালিত হয়নি।

৩৮ হিজরির শেষভাগে এবং ৩৯ হিজরির শুরুভাগে চতুর্থ খলিফা আলি ইবনে আবি তালিব রা.-এর খেলাফতের সময়ে তার অনুমতিক্রমে হারিস ইবনে মররা আবদি সিন্ধু সীমান্তে অভিযান আরম্ভ করেন এবং যথেষ্ট সফলতা লাভ করেন। তিনি প্রচুর গনিমত অর্জন করেন এবং শত্রুদের হতাহত করা ছাড়াও বহু লোককে বন্দি করেন। এমনকি একদিনে তিনি তার সৈন্যদের মধ্যে এক সহস্র বন্দি বণ্টন করে দেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হলে সিন্ধুর অন্তর্গত ‘কায়কান’ নামক স্থানে তারা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের শিকার হন। তারা বহু সৈন্যসহ সেখানে শাহাদাতবরণ করেন। হিজরি ৪২ সনে এই ঘটনা ঘটেছিল।

এরপর ৪৪ হিজরি সনে আমির মুআবিয়া রা.-এর শাসনামলে মুহাল্লাব ইবনে আবু সাফরা এই সীমান্ত দেশ আক্রমণ করেন। তিনি বিজয়ী বেশে মুলতান ও কাবুলের মধ্যবর্তী বান্না ও আহওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামও করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তার এই অভিযানের এখানেই ইতি ঘটে এবং তিনি এখানেই ইনতেকাল করেন। মুহাল্লাবের ইনতেকালের পর মুআবিয়া রা. আবদুল্লাহ ইবনে সওয়ারকে প্রেরণ করেন। তিনি আক্রমণ শাণিয়ে প্রচুর গনিমত লাভ করেন এবং সেই গনিমত থেকে মুআবিয়া রা.-এর জন্য একটি কয়কনি অশ্ব উপঢৌকনস্বরূপ নিয়ে যান। কিছুদিন মুআবিয়া রা.-এর নিকট অবস্থান করে পুনরায় সেখানে গমন করেন এবং তুর্কি দুর্বৃত্তের অতর্কিত আক্রমণে শাহাদাতবরণ করেন। এরপর আজদ গোত্রীয় রাশেদ ইবনে আমর জাদিদি কয়কনে আক্রমণ করে পুনরায় দখল করে নেন। কিন্তু কিছুদিন পর ময়দ-দেবল নামক স্থানের অভিযানে তিনি শহিদ হন। সিনান ইবনে সালামাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি এই ভূমি জয় করে সেখানে দুই বছর অবস্থান করেন। এরপর আব্বাস ইবনে জিয়াদ,

মুনজির ইবনে জারুদ আবদি হিন্দুস্তানের সীমান্তে জোরদার অভিযান চালান এবং বিজয়মাল্যে ভূষিত হন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বালাজুরি লিখেছেন, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সাকাফি ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হলে তিনি সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইবনে হারুন নামিরি, উবাইদুল্লাহ ইবনে নবহান ও বুদজল ইবনে বাজলিকে পর পর নিয়োজিত করেন। এরপর তিনি ৯৩ হিজরিতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমকে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর রসদসহ সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। তার দ্বারাই সিন্ধুতে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল জলে-স্থলে উভয়পথে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পাঠক অবগত হয়েছেন যে মহাভারত অভিমুখে ইসলামের বিজয় অভিযান মুহাম্মদ ইবনে কাসিম থেকে শুরু হয়নি। বরং সিন্ধু বিজয়ের লক্ষ্যে অভিযান শুরু হয়েছিল ওমর রা.-এর খেলাফত আমল থেকে। ওসমান রা.-এর সময় থানা ভরুজ ও দেবলের ওপর মুসলিমরা তিন তিনবার নৌ আক্রমণ চালিয়েছিলেন বলে সাইয়েদ সুলায়মান নদবি রাহ. তার 'আরবুঁকা জাহাজরানি' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০]

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম বিভিন্ন স্থান জয় করতে করতে রোজ শুক্রবার সিন্ধুর উপকূল অঞ্চল দেবল বন্দরে উপস্থিত হন। এই সময় তার জন্য নৌপথে পাঠানো রসদ হস্তগত হয়। ফলে তিনি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দেবলের সর্ববৃহৎ মন্দিরে হামলা চালান এবং বিজয় লাভ করেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম দেবলে মুসলিমদের জন্য জায়গিরের ব্যবস্থা করেন, মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি সেখানে চার হাজার মুসলিমের স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। এরপর তার জনৈক সেনাধ্যক্ষকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তিনি পুনরায় সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি যে স্থানই জয় করতেন সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। রাসল নামক স্থানে পৌঁছে তিনি সুকৌশলে একটি বিপজ্জনক সেতু অতিক্রম করেন। দেবল হারানো রাজা দাহির সেখানে

---

১০. আরবুঁকা জাহাজরানি, পৃ. ৫২।

সেনাবাহিনীসহ গোপনে অবস্থান করছিলেন। এই স্থানে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম কঠোর যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে তার সঙ্গে অন্যান্য সৈন্য ছাড়াও চার হাজার জাঠ সেনা শামিল হন। এই যুদ্ধে রাজা দাহির নিহত হওয়ায় সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম পুরাতন ব্রাহ্মণাবাদ জয় করে যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন ছাওয়ান্দরবাসী পথিমধ্যে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলা বাহুল্য যে ছাওয়ান্দরবাসী সবাই মুসলিম ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম তাদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছার পর অন্যান্য বহু স্থান জয় করে অবশেষে পশ্চিম পাঞ্জাবের বিখ্যাত মুলতান শহরে উপস্থিত হন এবং মুলতান জয় করেন।[১১]

বালাজুরির উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সিন্ধু জয় করার বহু পূর্ব থেকে ভারত উপমহাদেশে বহু মুসলিম বসবাস করতেন। আর এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে আরব বণিক ও নাবিকদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমনকি এর সামসময়িককালে আরবীয় বণিক, আরবীয় নাবিক ও সুফি-সাধকদের দ্বারা যে বাংলাদেশেও ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল তাও দিবালোকের মতো সত্য।

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে আলবেরুনি লেখেন, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ইবনে আল-মুনাব্বা সিজিস্তানের দিক থেকে সিন্ধু প্রবেশ করেন এবং বহমনওয়া ও মুলস্তান নামক নগরদুটি জয় করেন। তিনি প্রথম শহরটির 'আল-মনসুরা' ও দ্বিতীয় শহরটির 'আল-মামুরা' নামকরণ করেন। তিনি মরুভূমির কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করেন এবং কনৌজ পর্যন্ত অধিকার করেন। সেখান থেকে গান্ধার[১২] অভিমুখে

---

১১. বালাজুরি রচিত ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৪১-৪৪৫।

১২. গান্ধার আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের কাবুল ও সোয়াত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ইন্দো-আর্য রাজ্য। যার বর্তমান নাম কান্দাহার। এটি প্রাচীন ভারতের ১৬টি মহাজনপদের একটি। হাখমানেশি যুগে ও হেলেনীয় সময়ে রাজ্যটির রাজধানী ছিল চরসদ্দা, কিন্তু পরে ১২৭ খ্রিষ্টাব্দে কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক দ্বারা রাজধানী পেশোয়ার শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ঋগ্‌বেদের (১৫০০-১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সময়ও গান্ধারের অস্তিত্ব ছিল। পাশাপাশি জরাথুস্ট্রীয় আবেস্তায় এটি অহুর-মজদা দ্বারা নির্মিত পৃথিবীর ষষ্ঠ সবচেয়ে সুন্দর জায়গা ভাক্করুত্তা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হাখমানেশি সাম্রাজ্য গান্ধার রাজ্যকে অধিকৃত করে।

অভিযান পরিচালনা করেন। ফেরার পথে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যান। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তিনি কখনো অসি চালনা করেন আবার কখনো সন্ধি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন করেন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণকারীদের যেমন গ্রহণ করেন তেমনই প্রাচীন ও সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের স্ব স্ব ধর্মপালনের অধিকার দেন।

এভাবে আফগানিস্তান ও সিন্ধুতে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারিত ও এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বব্যাপী বন্যাস্রোতের মতো তা জল ও স্থলে উভয় পথে সমগ্র ভারতভূমি প্লাবিত করে অগ্রসর হয়েছিল

---

৩২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার গান্ধার রাজ্য জয় করেন। পরবর্তীকালে এটি মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে এবং তারপর ইন্দো-গ্রিক রাজত্ব তার অধিকারে যায়। ইন্দো-গ্রিক রাজবংশের অধীনে গ্রেকো-বৌদ্ধধর্মের জন্য এই অঞ্চলটি একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো। পরবর্তী সাম্রাজ্যের অধীনে গান্ধার বৌদ্ধধর্মের জন্য প্রধান বিবেচিত হতে থাকে। এটি মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতো। এটি ব্যাক্ট্রিয়ান জরাথুস্ত্রবাদ এবং হিন্দুধর্মেরও কেন্দ্র ছিল। গান্ধার (গেরো-বৌদ্ধ) শিল্প স্থানীয় ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। এটি কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীনে প্রথম শতাব্দী থেকে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত বিখ্যাত ছিল। গান্ধার এশিয়ার পারাপারের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সে বিভিন্ন সভ্যতার সাংস্কৃতিক প্রভাব গ্রহণ করে; মুসলিমরা এই অঞ্চলে রাজত্ব করতে শুরু করার পূর্বে ৮ম থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত রাজ্যটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। ১১ শতাব্দী পর্যন্ত পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দৃশ্যমান ছিল।

১০০১ খ্রিষ্টাব্দে মাহমুদ গাজনির বিজয় লাভ করার পর থেকে গান্ধার অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। মুসলিম শাসনামলে কখনো লাহোর থেকে এবং কখনো কাবুল থেকে এ অঞ্চলটি শাসিত হতো। মুঘল আমলে এটি কাবুল প্রদেশের একটি স্বাধীন জেলায় পরিণত হয়।

প্রায় ২৫০০ বছর আগে গান্ধার ছিল শিক্ষায়, কলায় ও ব্যবসায় বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। পাহাড়ে ঘেরা গান্ধারের আনাচেকানাচে, পেশোয়ারে, কাবুলের কাছে বাগরাম ও হাভ শহরে, বর্তমান কাশ্মীরের হারোয়ানে এবং পাঞ্জাবের তক্ষশীলায় আজও বহু গান্ধার শিল্পের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। গান্ধারের মূল শহরগুলো ছিল পুরুষপুর (যা আজকের পেশোয়ার), তক্ষশীলা ও পুষ্কলবর্তী। প্রথমদিকে পুষ্কলবর্তী ছিল গান্ধারের রাজধানী যা পরবর্তীকালে পেশোয়ারে সরিয়ে নেওয়া হয়। কাবুল নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল পুষ্কলবর্তী। গান্ধারের প্রধান শহর বা রাজধানী ছিল তক্ষশীলা যা দেশভাগের পর আজকের পাকিস্তানের অংশ। বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলা। খ্রিষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে স্থাপিত তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতির শিখরে ওঠে মৌর্যদের আমলে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান পরামর্শদাতা চাণক্য এক সময় তক্ষশীলার আচার্য্য ছিল। ছাত্রের সংখ্যা ছিল দশ হাজারের ওপরে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল ছাড়াও ছাত্ররা আসত ব্যাবিলন, গ্রিস, পারস্য ও চীন থেকে। পড়ানো হতো ভাষা, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, রাজনীতি, জ্যোতির্বিদ্যা, বাণিজ্য, অঙ্ক, সংগীত ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে সেখানে পড়েছেন ও পড়িয়েছেন অর্থশাস্ত্র এবং কূটনীতির জনক চাণক্য, পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জনক চড়ক, যোগসূত্র বা যোগার প্রতিষ্ঠাতা পতঞ্জলি, ব্যাকরণ বা গ্রামারের উদ্ভাবক পাণিনি।

বঙ্গোপসাগরের সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ ও তার উপকূলস্থিত সমতলভূমির দিকে। তবে অন্যান্য প্রায় সব অঞ্চলের চেয়ে বঙ্গে মুসলিমের সংখ্যা বেশি কেন তার কারণ চিহ্নিতকরণে ঐতিহাসিকগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আলাদা একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলব, ইসলামধর্ম যে ভারতে বিশেষত বাংলাদেশে এমন অসাধারণ সফলতা লাভ করেছিল তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে এর সহজাত অধ্যাত্মশক্তি। অন্য কারণগুলো অনুষঙ্গমাত্র।

ইসলামের প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে তাওহিদ—এক আল্লাহয় অখণ্ড ও অনাবিল বিশ্বাস। নরপূজা, প্রতীকপূজা, অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতার অভিশাপগুলোকে আল্লাহর দুনিয়া থেকে ধুয়ে-মুছে সেই সর্বশক্তিমান, সর্বমঙ্গলময় একমাত্র আল্লাহর আরাধনাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর সৃষ্টির সর্বোত্তম উপঢৌকন মানবসমাজকে তাঁরই নামে এক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃসমাজে পরিণত করা। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর আরবরা নিজেদের আবাসভূমি থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন প্রধানত এই আদর্শের প্রেরণায় আত্মহারা হয়ে।

ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ তার ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন, হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলিম বিজেতারা তুর্কি ছিলেন না; বরং তারা ছিলেন আরবীয়। মহানবির তিরোধানের অব্যবহিত পরেই এই আরবরা ইসলামের বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারকল্পে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েন। তাবলিগ পরিচালনার মধ্যেই রয়েছে আখেরাতের সাফল্য-ব্যর্থতা—এই ছিল তাদের চেতনা ও সংকল্প। এই আরবরা যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই শঙ্কাহীন দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। জাতীয়তার এই গৌরবময় প্রেরণা সম্বল করেই এই সত্যানুসারী আরবরা মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর ও পারস্যের অধিপতি হতে পেরেছিলেন। পারস্য দখল করার পর আরবরা তাদের এই বিজয়কে পূর্বদিকে আরও সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট হন। সিরাজ ও হরমুজের সওদাগররা তখন তেজারতি কার্যোপলক্ষ্যে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে যাতায়াত করতেন। আরবরা তাদের মুখেই ভারতের প্রাচুর্য ও এর অধিবাসীদের

বোতপোরস্তির খবর পেয়েছিলেন। প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে তারা ভারতে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, এই অভিযানের ব্যাপারে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ সমর্থনই পাওয়া যায় এবং ৬৩৬-৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ওমর রা.-এর খেলাফতের সময় ওমান থেকে ভারতের উপকূলভাগে আরবদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে।

মুসা আল হাফিজ লেখেন, এ অঞ্চলের গোটা পরিস্থিতি ইসলামকে অভিনন্দিত করার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করে রেখেছিল। কারণ এখানকার অসুখগুলো এতই ভয়াবহরূপ নিয়েছিল, যার চিকিৎসা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থায় আদৌ সম্ভব ছিল না। বৌদ্ধ ও জৈন মতাদর্শ ইতিপূর্বে এ চিকিৎসার প্রয়াস হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ও শিরিকের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তারা নিস্তেজ হয় এবং প্রচলিত ভাবধারায় হারিয়ে যেতে থাকে। অপরদিকে ইসলাম গোটা পৃথিবীকে মুক্তির পতাকাতলে সমবেত করার অভিযান চালাচ্ছিল। ফলে এখানকার জনতার মুক্তি ইসলামের কাছে গুরুত্ব না পাওয়ার কারণ ছিল না। ফলত নবিয়ে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ভারতে ইসলাম আলো ফেলতে থাকে। এখানকার জনতা একে শুধু স্বাগত জানায়নি, বরং এতে নিজেদের নবজীবন প্রত্যক্ষ করেছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইসলামে মুসলিম সমাজকে জ্ঞানাহরণের জন্য সুদূর চীন দেশেও ভ্রমণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদের ভারতে অভিযান পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

নাসায়ির রেওয়ায়েতে আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। অতএব, যদি আমি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তবে তাতে জান ও মাল ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হব না। এতে যদি আমি নিহত হই, তবে শ্রেষ্ঠ শহিদ বলে পরিগণিত

হব। আর যদি সহিসালামতে ফিরে আসি, তবে হব জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা।[১৩]

এই হাদিসে মুসলিম জাতিকে শুধু ভারত অভিযানে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি; বরং একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হবে যে এই হাদিসে ভারত অভিযানের অনিবার্যতাও ঘোষিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে যে মহাভারতে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার অভিযান পরিচালিত হবে সে কথা সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে।

১৩. নাসায়ি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২।

সিন্ধু থেকে বঙ্গ

ভারতীয় উপমহাদেশ

হাজার বছর মুসলিম শাসনের
স্বর্ণালি ইতিহাস

(৭১২–১৮৫৭ খ্রি.)

সিন্ধু থেকে বঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড

মনযূর আহমাদ

চেতনা

চেতনা

সিন্ধু থেকে বঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড)
মনযূর আহমাদ

প্রথম প্রকাশ | সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশক | খুরশিদ আমজাদী
স্বত্ব | প্রকাশক
ব্যবস্থাপক | বোরহান আশরাফী
সার্বিক সমন্বয় | সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশনায় | চেতনা
১১/১, ইসলামী টাওয়ার
দোকান নং ২০ (১ম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল নং : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩,
০১৩০৩-৮৫৫২২৫
অনলাইন পরিবেশক | রকমারি, ওয়াফি লাইফ, কুইককার্ট, বইজগৎ, সমাহার
প্রচ্ছদ | মুনির সাদাত
পৃষ্ঠাসজ্জা | আবু ওয়ারদাহ
মুদ্রণ | মা মনি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রিত মূল্য | ৮৫০ ৳

© প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

অর্পণ

মুহাম্মদ বিন কাসিম

যার সিন্ধু জয়ের ধারায় ভারত ইসলামকে
আপনের মতো বরণ করে নেয়

এবং

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি

যার বিস্ময় জাগানিয়া অভিযানের মধ্য দিয়ে বঙ্গে ইসলামের
বিজয়ী ধারার সূচনা হয়।

— বিষয় সূচি —

▶ কৈফিয়ত ও আশাবাদ ⁞ ২৫
▶ ভূমিকা ⁞ ২৯
▶ **প্রথম অধ্যায় : মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ⁞ ৩৭**
  ▶ মুঘলদের পরিচয় ⁞ ৩৭
  ▶ মুঘল শাসনের পটভূমি
  ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় ⁞ ৩৮
  ▶ **জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-৩০ খ্রি.) ⁞ ৩৯**
    ▶ বাবরের সিংহাসনে আরোহণ ⁞ ৪৩
    ▶ সমরকন্দ অভিযান (১৪৯৬-৯৭ খ্রি.) ⁞ ৪৪
    ▶ রাজ্যচ্যুত বাবর ⁞ ৪৫
    ▶ কাবুল বিজয় ⁞ ৪৬
    ▶ বাবরের আক্রমণকালে ভারতের অবস্থা ⁞ ৪৬
    ▶ বাবরের ভারত অভিযান ⁞ ৪৭
    ▶ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (২১ এপ্রিল ১৫২৬ খ্রি.) ⁞ ৪৯
    ▶ যুদ্ধের ফলাফল
    মুঘল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ স্থাপন ⁞ ৫২
    ▶ পানিপথের যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা ⁞ ৫২
    ▶ রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ⁞ ৫৩
    ▶ আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ⁞ ৫৬
    ▶ বাবরের মৃত্যু ⁞ ৫৬
    ▶ বাবরের কৃতিত্ব বিচার ⁞ ৫৮
    ▶ সৈনিক ও সেনাপতি হিসেবে বাবর ⁞ ৫৮
    ▶ 'তুজুক-ই-বাবর' বা বাবরের আত্মজীবনী ⁞ ৬২

▶ **দ্বিতীয় অধ্যায় : হুমায়ুন ও শের শাহ ⁞ ৬৩**

▶ **হুমায়ুন (১৫৩০-৪০ এবং ১৫৫৫-৫৬) ⁞ ৬৩**

▶ জন্ম ⁞ ৬৫

▶ সিংহাসনে আরোহণ ⁞ ৬৫

▶ হুমায়ুনের শাসনকাল ⁞ ৬৭

▶ হুমায়ুন ও গুজরাটের বাহাদুর শাহ ⁞ ৬৮

▶ **শের শাহ সুরি (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.) ⁞ ৭০**

▶ প্রাথমিক জীবন ⁞ ৭১

▶ হুমায়ুন ও শের খানের লড়াই ⁞ ৭৪

▶ হুমায়ুনের পরাজয়ের কারণ ⁞ ৭৬

▶ হুমায়ুনের পলায়ন ⁞ ৭৭

▶ শের শাহের রাজ্যজয় ⁞ ৭৮

▶ শের শাহের শাসনব্যবস্থা ⁞ ৭৯

▶ রাজস্ব সংস্কার ⁞ ৮২

▶ শুল্ক ও মুদ্রানীতির সংস্কার ⁞ ৮৩

▶ যোগাযোগ ব্যবস্থা ⁞ ৮৩

▶ জনহিতকর কার্য ⁞ ৮৪

▶ বিচার বিভাগ ⁞ ৮৫

▶ সামরিক সংস্কার ⁞ ৮৫

▶ ধর্মনীতি ⁞ ৮৬

▶ শের শাহের কৃতিত্ব বিচার ⁞ ৮৭

▶ শের শাহের উত্তরাধিকারীরা ⁞ ৯০

▶ **হুমায়ুনের রাজ্যোদ্ধার ⁞ ৯১**

▶ হুমায়ুনের ধর্মনীতি ⁞ ৯২

▶ হুমায়ুনের চরিত্র ⁞ ৯২

▶ তার মহত্ত্ব ⁞ ৯৩

▶ **তৃতীয় অধ্যায় : সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) ⁞ ৯৭**

▶ তৎকালীন ভারতের অবস্থা ⁞ ৯৮

▶ **পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রি.) ⁞ ১০০**

▶ বৈরাম খান ⁞ ১০১

▶ বিদ্রোহ ⁞ ১০৪

▶ আকবরের রাজপুত নীতি ⁞ ১০৪

▶ বিজয় ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ⁞ ১০৫

▶ চিতোর বিজয় ⁞ ১০৬

▶ গুজরাট বিজয় ⁞ ১০৭

▶ **আকবরের বঙ্গবিজয় (১৫৭৪-৭৬ খ্রি.) ⁞ ১১০**

▶ বঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযানের কারণ ⁞ ১১০

▶ কাবুল বিজয় ⁞ ১১৩

▶ অন্যান্য বিজয় ⁞ ১১৩

▶ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি ⁞ ১১৪

▶ দাক্ষিণাত্য অভিযান ⁞ ১১৬

▶ আকবরের শেষ জীবন ⁞ ১১৯

▶ আকবরের শাসনব্যবস্থা ⁞ ১২০

▶ কেন্দ্রীয় শাসন ⁞ ১২২

▶ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ⁞ ১২৪

▶ রাজস্ব ব্যবস্থা ⁞ ১২৬

▶ সামরিক বিভাগ ⁞ ১৩০

▶ মনসবদারি প্রথা ⁞ ১৩২

▶ আকবরের সংস্কারকার্য ⁞ ১৩৫

▶ আকবরের ধর্মীয় নীতি ⁞ ১৩৫

▶ **চতুর্থ অধ্যায় : দ্বীনে ইলাহি ⁞ ১৪৩**

▶ হিন্দুদের প্রতি আকবরের নীতি ⁞ ১৪৭

▶ আকবর ও পর্তুগিজগণ ⁞ ১৪৯

▸ সাহিত্য ও শিল্প ⁞ ১৪৯
▸ আকবরের কৃতিত্ব-বিচার ⁞ ১৪৯

▸ **পঞ্চম অধ্যায় : জাহাঙ্গির (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) ⁞ ১৫৩**
▸ সিংহাসন আরোহণ ⁞ ১৫৪
▸ যুবরাজ খসরুর বিদ্রোহ ⁞ ১৫৪
▸ পারস্যের সাফাবিদের সঙ্গে সম্পর্ক ⁞ ১৫৫
▸ নুরজাহান ⁞ ১৫৬
▸ বঙ্গে বিদ্রোহ ⁞ ১৫৯
▸ মেবারের আত্মসমর্পণ ⁞ ১৫৯
▸ দাক্ষিণাত্য অভিযান ⁞ ১৬০
▸ শাহজাদা খুররমের বিদ্রোহ ⁞ ১৬১
▸ মহব্বত খানের বিদ্রোহ ⁞ ১৬২
▸ জাহাঙ্গিরের কৃতিত্ব বিচার ⁞ ১৬৩
▸ ইউরোপীয়দের সঙ্গে জাহাঙ্গিরের সম্পর্ক ⁞ ১৬৫

▸ **ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্য এক জাহাঙ্গির ⁞ ১৭১**

▸ **সপ্তম অধ্যায় : সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গির এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানি ⁞ ১৭৫**
▸ আকবরের রাজনীতি ⁞ ১৭৬
▸ দ্বীনে ইলাহির মূল প্রতিপাদ্য মুনতাখাবুত তাওয়ারিখের ভাষ্য ⁞ ১৭৮
▸ মুরিদ করার নিয়ম ⁞ ১৮০
▸ এ ছাড়া আরও যা বিধান করা হয়েছিল ⁞ ১৮১
▸ দাড়ির অবমাননা ⁞ ১৮১
▸ বৈবাহিক বিধান ⁞ ১৮২
▸ পর্দার বিধান ⁞ ১৮২
▸ ব্যভিচারের বিধান ⁞ ১৮২
▸ খতনাপ্রথা ⁞ ১৮২

- মৃতের সৎকার ⁞ ১৮২
- অসৎ আলেমের ফেতনা ⁞ ১৮৫
- সম্রাটের ইজতেহাদের দাবি ⁞ ১৯০
- আকবর কী চেয়েছিলেন? ⁞ ১৯৪
- আকবরের ধর্মপ্রচারের নীতিমালা ⁞ ১৯৫
- আকবরের মৃত্যু ⁞ ১৯৬
- আকবরের শাসনামলে মুসলিম সমাজের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিল? ⁞ ১৯৭
- জাহাঙ্গির কেমন ছিলেন ⁞ ১৯৭
- কিছু জরুরি তথ্য ⁞ ২০০
- নুরজাহানের কাহিনি ⁞ ২০১

অষ্টম অধ্যায় : মুজাদ্দিদে আলফে সানি ⁞ ২০৫

- মুজাদ্দিদ সাহেবের সংগ্রামের সূচনা ⁞ ২১০
- কেন মুজাদ্দিদ সাহেব বিদ্রোহ করেননি? ⁞ ২১৬
- গ্রেফতার ও শাস্তি ⁞ ২১৮
- মুজাদ্দিদ সাহেবের জেলমুক্তি ও তাকে শাহি সেনাবাহিনীর হেফাজতে অর্পণ ⁞ ২২৩
- মুজাদ্দিদ সাহেবের মৃত্যু ⁞ ২২৭
- মুজাদ্দিদের সংজ্ঞা এবং শায়েখ আহমদ সেরহিন্দিকে কেন মুজাদ্দিদ বলা হয়? ⁞ ২২৮
- মুজাদ্দিদ সাহেবের খলিফা ও সন্তানগণ ⁞ ২৩৩

নবম অধ্যায় : শা হ জা হা ন (১৬২৮-১৬৬৬ খ্রি.) ⁞ ২৪৩

- উত্তরাধিকার লাভের সংগ্রাম (১৬২৮ খ্রি.) ⁞ ২৪৪
- শাহজাহানের প্রাথমিক কার্যাবলি ⁞ ২৪৫
- জুঝহার সিংহ ও খানজাহানের বিদ্রোহ দমন ⁞ ২৪৬
- সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল ⁞ ২৪৬
- দানশীলতা ও ধর্মপরায়ণতা ⁞ ২৪৭
- শাহজাহান ও পর্তুগিজরা

শাহজাহানের বিরাগের কারণ ┆ ২৪৮
▶ কাসিম খান কর্তৃক পর্তুগিজদের দমন ┆ ২৪৯
▶ ১৬৩০-১৬৩২ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ┆ ২৪৯
▶ শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য নীতি
দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ ┆ ২৫০
▶ ফতেহ খানের বিশ্বাসঘাতকতা ┆ ২৫০
▶ আহমদনগর অধিকার (১৬৩২ খ্রি.) ┆ ২৫১
▶ বিনা বাধায় গোলকুন্ডার সুলতানের আনুগত্য স্বীকার ┆ ২৫১
▶ আদিল শাহের পরাজয় ┆ ২৫১
▶ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি
কান্দাহার পুনরুদ্ধার (১৬৩৮ খ্রি.) ┆ ২৫২
▶ মধ্য-এশিয়ায় তার নীতি ┆ ২৫২
▶ মধ্য-এশিয়া অভিযানের ব্যর্থতা ┆ ২৫৩
▶ শাহ আব্বাস কর্তৃক কান্দাহার পুনরাধিকার ┆ ২৫৩
▶ দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব ┆ ২৫৩
▶ আওরঙ্গজেবের পদত্যাগ ┆ ২৫৪
▶ উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব—শাহজাহানের অসুস্থতা ┆ ২৫৪
▶ বিভিন্ন প্রদেশে শাহজাহানের পুত্রদের নিয়োগ ┆ ২৫৫
▶ উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের কারণ ┆ ২৫৫
▶ উত্তরাধিকার নির্বাচনে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অভাব : প্রথমত ┆ ২৫৫
▶ ভাইদের প্রতি দারার ব্যবহার : দ্বিতীয়ত ┆ ২৫৬
▶ ভাইদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : তৃতীয়ত ┆ ২৫৬
▶ আওরঙ্গজেবের প্রতি শাহজাহানের নীতি ┆ ২৫৮
▶ ত্রিকেন্দ্রিক মৈত্রীবোধ ও প্রত্যেক পুত্রের নিকট শাহজাহানের পত্র ┆ ২৫৮
▶ উত্তরাধিকার সংগ্রামের প্রধান ঘটনাবলি ┆ ২৫৯
▶ বাহাদুরগড়ের যুদ্ধ ও সুজার পরাজয় ┆ ২৫৯
▶ ধর্মাটের যুদ্ধ (১৬৫৮ খ্রি.) ┆ ২৫৯
▶ সামুগড়ের যুদ্ধ ┆ ২৬০

▸ শাহজাহানের বন্দিজীবন ⁞ ২৬০
▸ আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা লাভ ⁞ ২৬১
▸ মুরাদের বন্দিত্ব ও মৃত্যুদণ্ড ⁞ ২৬১
▸ দেওয়াইয়ের যুদ্ধ ⁞ ২৬১
▸ জিওয়ান খানের বিশ্বাসঘাতকতা ⁞ ২৬২
▸ সোলায়মানের মৃত্যু ⁞ ২৬২
▸ সুজার ভাগ্যবিপর্যয় ⁞ ২৬২
▸ শাহজাহানের দুর্বলতা ও ভ্রান্তনীতি ⁞ ২৬৩
▸ আওরঙ্গজেবের উপযুক্ততা ⁞ ২৬৩
▸ আওরঙ্গজেবের উন্নত চরিত্র ও
ইসলামের প্রতি তার অনুরাগ ছিল তার সাফল্যের মূল কারণ ⁞ ২৬৪
▸ শাহজাহানের শেষ জীবন অর্থাৎ অনিশেষ কষ্টের জীবন ⁞ ২৬৪
▸ শাহজাহানের মৃত্যু ⁞ ২৬৫

▸ **দশম অধ্যায় : শাহজাহানের শাসনব্যবস্থা ⁞ ২৬৭**
▸ শাহজাহানের রাজত্বকালে সুবার সংখ্যা ⁞ ২৬৭
▸ সামন্ত ব্যবস্থা, মনসবদারি ও জায়গিরদারি প্রথা ⁞ ২৬৭
▸ রাজস্ব ব্যবস্থা
ভূমিরাজস্ব ছিল আয়ের প্রধান উৎস ⁞ ২৬৮
▸ বিচারব্যবস্থা
শাহজাহানের ন্যায়বিচারের প্রশংসা ⁞ ২৬৮
▸ স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা
স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ⁞ ২৬৯
▸ তাজমহল শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি ⁞ ২৬৯
▸ জাম-ই-মসজিদ ও মতি মসজিদ ⁞ ২৭০
▸ দিওয়ান-ই-খাস ও দিওয়ান-ই-আম ⁞ ২৭০
▸ ময়ূর সিংহাসন ⁞ ২৭১
▸ নাদির শাহ কর্তৃক ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন ⁞ ২৭১

▸ শাহজাহানের চরিত্র ┆ ২৭১
▸ জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্ত ┆ ২৭২
▸ শাহজাহানের কৃতিত্ব বিচার ┆ ২৭৩
▸ সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা ┆ ২৭৩
▸ বিদেশি পর্যটকদের বর্ণনা ┆ ২৭৪
▸ শিল্প ও স্থাপত্য ┆ ২৭৪
▸ সাহিত্য ও সাহিত্যিক ┆ ২৭৫
▸ সংগীত ┆ ২৭৫
▸ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ┆ ২৭৫
▸ প্রথম দুর্বলতার প্রকাশ ┆ ২৭৬
▸ আদর্শে ও মননে সমৃদ্ধ মহান সম্রাট শাহজাহান ┆ ২৭৬
▸ সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা ও সংস্কারসমূহ ┆ ২৮১
▸ শাহজাহানের দুর্বলতা ┆ ২৮৫

▸ **একাদশ অধ্যায় : আওরঙ্গজেব আলমগির (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) ┆ ২৯৩**

▸ **জন্ম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ┆ ২৯৫**
▸ জন্ম ┆ ২৯৫
▸ শিক্ষা ┆ ২৯৬
▸ মেধা ও প্রজ্ঞা ┆ ২৯৬
▸ পবিত্র কোরআন হিফজ ┆ ২৯৭
▸ শৈশবের বীরত্ব ┆ ২৯৭
▸ পদদান ┆ ২৯৮
▸ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ও দারার শত্রুতা ┆ ২৯৮
▸ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তারূপে আওরঙ্গজেব প্রথমবার ┆ ৩০০
▸ আওরঙ্গজেবের সিংহাসনে আরোহণ
আওরঙ্গজেবের নীতি ┆ ৩০২
▸ রাজত্বকালের দুই ভাগ ┆ ৩০৩

▸ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ⁞ ৩০৩
▸ অহোমদের আবির্ভাব ⁞ ৩০৪
▸ শাহজাহানের আমলে ⁞ ৩০৪
▸ অহোমদের সঙ্গে মির জুমলার যুদ্ধ ⁞ ৩০৪
▸ মির জুমলার মৃত্যুতে আসাম হস্তচ্যুত ⁞ ৩০৫
▸ শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম অধিকার ⁞ ৩০৫
▸ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতি আফগান উপজাতির বিদ্রোহ ⁞ ৩০৫
▸ ইউসুফজাইদের বিদ্রোহ দমন ⁞ ৩০৬
▸ আফ্রিদিদের বিদ্রোহ ⁞ ৩০৬
▸ খটক উপজাতির বিদ্রোহ ⁞ ৩০৬
▸ আফগানদের বিরুদ্ধে সাফল্য ⁞ ৩০৭
▸ আমির খান কাবুলের শাসনকর্তা ⁞ ৩০৭
▸ আওরঙ্গজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-নীতির ফলাফল ⁞ ৩০৭
▸ আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ও হিন্দু সম্প্রদায় ⁞ ৩০৭
▸ আওরঙ্গজেবের ফরমান ⁞ ৩০৮
▸ ধর্মীয় কারণে মন্দির ধ্বংস করা হয়নি ⁞ ৩০৮
▸ বিদ্যালয় ধ্বংসের কথা সত্য নয় ⁞ ৩০৯
▸ হিন্দুদের উচ্চপদ দান ⁞ ৩০৯
▸ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে জিজিয়া-করের পুনঃপ্রবর্তন ⁞ ৩১০
▸ হিন্দুদের বিরোধিতার কারণ—
যথাযথ ধর্মপালনের কারণে অনেকের অসন্তোষভাজন ⁞ ৩১০
▸ দারার পরাজয়ের ফলে হিন্দুদের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন ব্যর্থ ⁞ ৩১১
▸ ধর্মীয় নীতির প্রতিক্রিয়া ⁞ ৩১২
▸ জাঠ বিদ্রোহ ⁞ ৩১২
▸ গোকুলের নেতৃত্বে জাঠ বিদ্রোহ ⁞ ৩১২
▸ বান্দেলা বিদ্রোহ (ছত্রশালের নেতৃত্বে বান্দেলাদের বিদ্রোহ) ⁞ ৩১২
▸ সাতনমি বিদ্রোহ ⁞ ৩১৩
▸ শিখ বিদ্রোহ ⁞ ৩১৩

▶ ভেজবাহাদুরের মৃত্যুদণ্ড ⁞ ৩১৩
▶ গুরুগোবিন্দের শিখ সামরিক দল গঠন ⁞ ৩১৩
▶ রাজপুতদের প্রতি আওরঙ্গজেবের নীতি—
যদুনাথ সরকারের মন্তব্য ⁞ ৩১৩
▶ বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মারওয়াড় দখল করা হয়নি ⁞ ৩১৪
▶ মারওয়াড়কে বিভক্ত করা রাজপুত যুদ্ধের কারণ ছিল না ⁞ ৩১৪
▶ সম্ভাব্য সুদক্ষ নেতার অপসারণের অভিযোগ সত্য নয় ⁞ ৩১৫

▶ **ঘটনাবলি ⁞ ৩১৬**
▶ যুবরাজ অজিত সিংহকে রাজদরবারে হাজির করার নির্দেশ ⁞ ৩১৬
▶ যুদ্ধের কারণ ⁞ ৩১৭
▶ মারাঠিদের উত্থান ⁞ ৩১৯
▶ মারাঠিদের পরিচয় ⁞ ৩১৯
▶ মারাঠিদের জাতীয় চেতনা ⁞ ৩১৯
▶ শিবাজির পরিচয় ⁞ ৩১৯
▶ বিজাপুর আক্রমণ ⁞ ৩২০
▶ আওরঙ্গজেব ও শিবাজি শায়েস্তা খানের ওপর অতর্কিত আক্রমণ ⁞ ৩২১
▶ পুরন্দরের সন্ধি ⁞ ৩২২
▶ শিবাজির নাটকীয়ভাবে পলায়ন ⁞ ৩২২
▶ 'রাজা' উপাধি ধারণ ⁞ ৩২৩
▶ মৃত্যু (১৬৮০ খ্রি.) ⁞ ৩২৩
▶ শিবাজির কৃতিত্ব ও চরিত্র ⁞ ৩২৩
▶ তার চরিত্র ⁞ ৩২৪
▶ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির উদ্দেশ্য ⁞ ৩২৪
▶ কারণ ⁞ ৩২৫
▶ দাক্ষিণাত্য অভিযানের তিনটি পর্যায় ⁞ ৩২৫
▶ শিবাজির বিরুদ্ধে মুঘলদের অভিযান ⁞ ৩২৬
▶ শম্ভুজির বিরুদ্ধে অভিযান ⁞ ৩২৬
▶ বিজাপুর ও গোলকুন্ডা বিজয় ⁞ ৩২৭

▸ দাক্ষিণাত্যে মুঘল কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ⋮ ৩২৭

▸ **সমালোচনা ⋮ ৩২৮**

- ▸ সম্রাটের অদূরদর্শিতা ⋮ ৩২৮
- ▸ দাক্ষিণাত্য নীতির যথার্থতা ⋮ ৩২৮
- ▸ দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধনীতির পরিণাম ⋮ ৩২৯
- ▸ মারাঠিদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার কারণ ⋮ ৩৩০

▸ **আওরঙ্গজেব ও ইংরেজ ⋮ ৩৩১**

- ▸ আওরঙ্গজেবের পূর্বে ইংরেজদের অবস্থা ⋮ ৩৩১
- ▸ মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ ⋮ ৩৩১
- ▸ ফরমান লাভ ⋮ ৩৩২

▸ **আওরঙ্গজেবের চরিত্র বিচার ⋮ ৩৩২**

- ▸ মুসলিম শাসিত ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ⋮ ৩৩২
- ▸ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোরতা ⋮ ৩৩২
- ▸ সম্রাটের আদর্শ ⋮ ৩৩৩
- ▸ সেনাপতি হিসেবে দক্ষতা ⋮ ৩৩৪
- ▸ মহানুভব শাসক ⋮ ৩৩৪
- ▸ নিরপেক্ষ বিচারক ⋮ ৩৩৪
- ▸ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার উদার পৃষ্ঠপোষক ⋮ ৩৩৫
- ▸ পরধর্মে সহিষ্ণুতা ⋮ ৩৩৬
- ▸ সরল ও অমলিন জীবনযাপন ⋮ ৩৩৬

▸ **দ্বাদশ অধ্যায় : মসনদ সম্পর্কীয় বিরোধের কারণ ও তার দালিলিক বিবরণ ⋮ ৩৩৯**

▸ শাহজাহানের অসুস্থতা ও অপসারণ ⋮ ৩৩৯

▸ কে শাহজাহানকে অপসারণ করেছে ⋮ ৩৪১

▸ ভাইদের পারস্পরিক যুদ্ধ ⋮ ৩৪৪

▸ সিংহাসনে আরোহণের পর ⋮ ৩৪৮

▸ একটি প্রশ্ন ও উত্তর ⋮ ৩৪৯

▶ আলমগির শাহজাহানকে পদচ্যুত করে রেখেছিলেন কেন? ⁞ ৩৫০
▶ শাহজাহানের ক্ষমা ⁞ ৩৫৪
▶ দুটি কথা ⁞ ৩৫৪
▶ মুরাদ হত্যা ⁞ ৩৫৪
▶ সুজার পলায়ন ⁞ ৩৫৯
▶ আলমগির ও হিন্দুসমাজ ⁞ ৩৬৪
▶ মারাঠিদের সঙ্গে যুদ্ধ ⁞ ৩৬৬
▶ শম্ভুজি ⁞ ৩৭৪
▶ সফরের সমাপ্তি ⁞ ৩৭৭
▶ ইনতেকাল ⁞ ৩৭৭
▶ অসিয়তনামা ⁞ ৩৭৯
▶ ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা ⁞ ৩৮০
▶ সংবাদ সংগ্রহ ⁞ ৩৮১
▶ শরিয়তি উকিল নিয়োগ ⁞ ৩৮২
▶ বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ সতর্কতা ⁞ ৩৮৩
▶ তার তাকওয়া, ধর্মীয় অনুভূতি ও পার্থিবতা বিমুখতা ⁞ ৩৮৩
▶ ইবাদত ⁞ ৩৮৬
▶ আধ্যাত্মিক কামালত ⁞ ৩৮৬
▶ এহতেসাব ⁞ ৩৮৭
▶ জ্ঞান ও মর্যাদা ⁞ ৩৮৮
▶ ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ⁞ ৩৮৮
▶ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ⁞ ৩৮৯
▶ সম্মান প্রদর্শনের রেওয়াজের পরিবর্তন ⁞ ৩৮৯
▶ মানবিক সমতার বাস্তবায়ন ⁞ ৩৯০
▶ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ⁞ ৩৯০
▶ কষ্টসহিষ্ণুতা ⁞ ৩৯১
▶ দানশীলতা ⁞ ৩৯১
▶ বীরত্ব ⁞ ৩৯২

▸ সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা ⁞ ৩৯৩
▸ আলমগির এবং হিন্দু পদস্থরা ⁞ ৩৯৬
▸ জিজিয়া ⁞ ৪০০

▸ **ত্রয়োদশ অধ্যায় : অস্তাচলে মুঘল সাম্রাজ্য** ⁞ ৪০৭
▸ **বাহাদুর শাহ (১৭০৮-১৭১২ খ্রি.) ⁞ ৪০৭**
▸ গৃহযুদ্ধ ⁞ ৪০৭

▸ **ফররুখ শিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রি.) ⁞ ৪০৮**
▸ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্তৃত্ব ⁞ ৪০৮

▸ **মুহাম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খ্রি.) ⁞ ৪০৮**
▸ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন ⁞ ৪০৮
▸ স্বাধীনতা ঘোষণা ও নাদির শাহের আক্রমণ ⁞ ৪০৯
▸ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ⁞ ৪০৯

▸ **নাদির শাহ ⁞ ৪০৯**
▸ ভারত আক্রমণের কারণ ⁞ ৪০৯
▸ নাদির শাহ কর্তৃক দিল্লি শহর লুণ্ঠন ⁞ ৪১০
▸ আহমদ শাহ আবদালি কর্তৃক ভারত আক্রমণ ⁞ ৪১০
▸ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ ⁞ ৪১০
▸ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের কারণ ⁞ ৪১১
▸ তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের ফলাফল ⁞ ৪১১

▸ **চতুর্দশ অধ্যায় : এই সময়ের মহান নকিব শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি** ⁞ ৪১৩
▸ একনজরে অষ্টাদশ শতাব্দী ⁞ ৪১৩
▸ সংকট নির্ণয় ও প্রতিকার ⁞ ৪১৬
▸ বিপ্লব সাধনের পদ্ধতি ⁞ ৪১৮
▸ শাহ ওয়ালিউল্লাহর সংস্কার ⁞ ৪১৯
▸ শাহ ওয়ালিউল্লাহর অর্থনৈতিক দর্শন ⁞ ৪২০

- ▶ সরকারব্যবস্থার বুনিয়াদি নীতিমালা ⁞ ৪২২
- ▶ মৌলিক মানবিক অধিকার ⁞ ৪২২
- ▶ আন্তর্জাতিকতার নীতিমালা ⁞ ৪২৩
- ▶ ধর্মনীতি ⁞ ৪২৪
- ▶ জিহাদ ⁞ ৪২৪
- ▶ উপরিউক্ত আলোচনার বিশ্লেষণ ⁞ ৪২৫
- ▶ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন নৈতিক উন্নতির ওপর নির্ভরশীল ⁞ ৪২৬
- ▶ গ. গণমানুষের জীবনে সুখ-শান্তি স্থাপিত হওয়ার মূলনীতি ও অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা রোধের প্রথম শর্ত ⁞ ৪৩১
- ▶ জিহাদ ⁞ ৪৩২
- ▶ আভিধানিক অর্থ ⁞ ৪৩৩
- ▶ পারিভাষিক অর্থ ⁞ ৪৩৪

▶ পঞ্চদশ অধ্যায় : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ⁞ ৪৩৯

- ▶ আওরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরাধিকারী ⁞ ৪৪০
- ▶ উত্তরাধিকারী নির্বাচনে নির্দিষ্ট নিয়মের অভাব ⁞ ৪৪০
- ▶ অভিজাতবর্গের নৈতিক অবনতি ⁞ ৪৪১
- ▶ সামরিক শক্তির অবনতি ⁞ ৪৪১
- ▶ আর্থিক অবনতি ⁞ ৪৪২
- ▶ নৌবলের অভাব ⁞ ৪৪২
- ▶ হিন্দু জারগণ ⁞ ৪৪২
- ▶ সাম্রাজ্যের বিশালতা ⁞ ৪৪৩
- ▶ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ ⁞ ৪৪৩
- ▶ দুর্বল শাসনব্যবস্থা ⁞ ৪৪৩
- ▶ বৈদেশিক আক্রমণ ⁞ ৪৪৪

▶ ষোড়শ অধ্যায় : মুঘল শাসনব্যবস্থায় সমাজ ও সংস্কৃতি ⁞ ৪৪৫

- ▶ মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান পুরুষ আকবর ⁞ ৪৪৫

▸ **সামাজিক অবস্থা ⁞ ৪৪৫**

▸ অভিজাত শ্রেণি ⁞ ৪৪৫

▸ মধ্যবিত্ত শ্রেণি ⁞ ৪৪৫

▸ সাধারণ শ্রেণি ⁞ ৪৪৬

▸ সামাজিক রীতিনীতি ⁞ ৪৪৬

▸ **অর্থনৈতিক অবস্থা ⁞ ৪৪৬**

▸ আকবরের পূর্বে অর্থনৈতিক অবস্থা ⁞ ৪৪৬

▸ আর্থিক সচ্ছলতা ⁞ ৪৪৮

▸ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য ⁞ ৪৪৮

▸ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ⁞ ৪৪৯

▸ মুঘল আমলে শিক্ষা ⁞ ৪৪৯

▸ সুবিচার ও ন্যায়নীতি ⁞ ৪৫১

▸ নাগরিক সমানাধিকার ⁞ ৪৫৪

▸ চাকরির অধিকার ⁞ ৪৫৫

▸ ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ ⁞ ৪৫৮

▸ **সপ্তদশ অধ্যায় : হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক** ⁞ ৪৫৯

▸ **অষ্টাদশ অধ্যায় : মুঘল আমলে শিল্প** ⁞ ৪৭৩

▸ রপ্তানি ⁞ ৪৭৫

▸ তুলা ও সুতা ⁞ ৪৭৫

▸ মোটা সুতিবস্ত্র ⁞ ৪৭৫

▸ বাফতাহ ⁞ ৪৭৫

▸ সিট কাপড় ⁞ ৪৭৬

▸ রেশম ⁞ ৪৭৭

▸ টাসার ⁞ ৪৭৭

▸ নীল ⁞ ৪৭৭

▸ হীরক ⁞ ৪৭৮

▸ চিনি ⁞ ৪৭৮

▶ কাগজ ⁝ ৪৭৮
▶ কাঠের সরঞ্জামাদি ⁝ ৪৭৮
▶ সুতির গালিচা ⁝ ৪৭৯
▶ কাচের পাত্র ⁝ ৪৭৯
▶ লৌহশিল্প ⁝ ৪৭৯
▶ অস্ত্র তৈরির কেন্দ্র ⁝ ৪৮১
▶ সামুদ্রিক জাহাজ ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প ⁝ ৪৮১
▶ সুখ-শান্তি ⁝ ৪৮৩

▶ **ঊনবিংশ অধ্যায় : শিক্ষা ও সাহিত্য** ⁝ ৪৮৫
▶ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা ⁝ ৪৮৫
▶ মাদরাসা নির্মাণ ⁝ ৪৮৫
▶ বাবর ও হুমায়ুনের আমলে সাহিত্যচর্চা ⁝ ৪৮৫
▶ আকবরের আমলে শিল্প ও সাহিত্য ⁝ ৪৮৬
▶ জাহাঙ্গিরের আমলে ঐতিহাসিক গ্রন্থ ⁝ ৪৮৮
▶ শাহজাহানের আমল ⁝ ৪৮৮
▶ আওরঙ্গজেরেব আমল ⁝ ৪৮৮
▶ মুঘল শাহজাদিদের সাহিত্যসাধনা ⁝ ৪৮৯
▶ হিন্দি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ⁝ ৪৮৯
▶ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা ⁝ ৪৮৯
▶ স্থাপত্যশিল্প ⁝ ৪৯০
▶ মুঘল যুগের স্থাপত্যরীতি ⁝ ৪৯০
▶ বাবরের আমল ⁝ ৪৯১
▶ হুমায়ুনের আমল ⁝ ৪৯১
▶ শের শাহের নির্মিত ভবনগুলো ⁝ ৪৯১
▶ আকবরের আমল ⁝ ৪৯২
▶ জাহাঙ্গিরের আমল ⁝ ৪৯৩
▶ শাহজাহানের আমলে স্থাপত্যশিল্প ⁝ ৪৯৩

▸ স্থাপত্যশিল্পের অগ্রগতি ⁞ ৪৯৫
▸ তাজমহল ⁞ ৪৯৫
▸ অপরাপর ভবন ⁞ ৪৯৫
▸ বাদশাহি মসজিদ ⁞ ৪৯৮

▸ **চিত্রকলা ⁞ ৪৯৮**
  ▸ বাবরের আমল ⁞ ৪৯৮
  ▸ হুমায়ুনের আমল ⁞ ৪৯৮
  ▸ আকবরের পৃষ্ঠপোষকতা ⁞ ৪৯৯
  ▸ জাহাঙ্গিরের সময়ে চিত্রকলার উন্নতি ⁞ ৪৯৯
  ▸ আওরঙ্গজেবের আমল ⁞ ৫০০

▸ **সংগীতচর্চা ⁞ ৫০০**
  ▸ বাবর ⁞ ৫০০
  ▸ হুমায়ুন ⁞ ৫০১

▸ **সুর শাসকগণ ⁞ ৫০১**
  ▸ আকবর ⁞ ৫০১
  ▸ জাহাঙ্গির ⁞ ৫০২
  ▸ শাহজাহান ⁞ ৫০২
  ▸ আওরঙ্গজেব ⁞ ৫০২

▸ **বিংশ অধ্যায় : ভারতবর্ষে সভ্যতা নির্মাণে ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান** ⁞ ৫০৩